গান্ধীজির জীবনপ্রভাত

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

গান্ধীজির জীবনপ্রভাত প্রথম প্রকাশিত হয় আমাদের স্বাধীনতা-লাভের অব্যবহিত পূর্বে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে। যে গান্ধীজি তখন আমাদের সম্মুখে বর্তমান ছিলেন তাঁহার প্রদীপ্ত প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বইখানি লিখিয়াছিলাম। আজ তাঁহার ছবির দিকে চাহিয়া তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিতে হইল।

গান্ধীজির ছাত্রজীবন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান এবং মনোজ্ঞ তথ্য এই সংস্করণে সংকলিত হইয়াছে। নবজীবন ট্রাস্ট হইতে প্রকাশিত গান্ধীজির জীবন ও সাধনা বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষত, প্যারেলাল প্রণীত মহাত্মা গান্ধী : দি আর্লি ফেজ প্রথম খণ্ড হইতে কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছি। ভারত সরকারের পাবলিকেশন ডিভিসন হইতে প্রকাশিত এবং জে. এম. উপাধ্যায় সম্পাদিত মহাত্মা গান্ধী অ্যাজ্ এ স্টুডেণ্ট বইটিও অনেক কাজে লাগিয়াছে। সংশ্লিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। গান্ধীজি যেবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন সেবারকার প্রশ্নপত্রগুলি শেষোক্ত বইখানি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারির পরীক্ষার্থীরা তাঁহাদের একালকার প্রশ্নপত্রের সহিত এই প্রশ্নগুলি মিলাইয়া দেখিলে উপকৃত হইবেন।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক যে বালকটি পরাধীনতার গ্লানি বহন করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজও সে আমাদেরই মধ্যে বর্তমান আছে। সেবাগ্রাম আশ্রমের আলো পৃথিবীর পথ-ভোলা সকল মানুষকে আজ পথের নির্দেশ দিতেছে। সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে, হিংসা করিয়ো না। সুপ্রাচীন কালে কপিলবস্তুর রাজকুমার রাজ্য-ঐশ্বর্য ভোগসুখ খ্যাতিপ্রতিপত্তি সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মুক্তিপথ সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহারও মন্ত্র ছিল 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'। আধুনিক যুগের এই বুদ্ধদেবও অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন। শাক্যসিংহের মত সমগ্র মনুষ্যজাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছেন। বাক্যে, কর্মে এবং আচরণে এই সন্ন্যাসী যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন—গ্রহণ করা অনায়াসসাধ্য না হইলেও, তাহা যে সম্মানের যোগ্য এ-কথা সমগ্র পৃথিবী স্বীকার করিয়াছে। বার বৎসরের বালক আজ সাতাত্তরে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি এখনও তাহার অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। শুধু ভারতবাসী নহে, সমগ্র মানবজাতিকে অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আজও গান্ধীজির চেষ্টার অন্ত নাই।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সত্যানুরাগ ও ন্যায়নিষ্ঠা— চরিত্রের এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই গান্ধীজিকে জগজ্জয়ী করিয়াছে। এই গুণগুলি শিশুকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়া, অস্ফুট কোরক হইতে প্রস্ফুট কুসুমের ন্যায়, সারা জীবন ধরিয়া ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিয়াছে। গান্ধীচরিত্রে এই ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কবি নর্মদ রচিত গুজরাটী গানের বাংলা পদ্যানুবাদের জন্য সুকবি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

আশুতোষ কলেজ
কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

বিনীত
গ্রন্থকার

—

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল হইতে সময় যে খুব বেশী কাটিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর ঘটিয়া গেল।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনেতিহাস সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল বোধ হয় সেই কারণেই কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গান্ধীজির জীবনপ্রভাত যে সে কৌতূহল মিটাইতে কিছুটাও সাহায্য করিয়াছে তাহার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

আশুতোষ কলেজ
কলিকাতা, পৌষ ১৩৫৪

বিনীত
গ্রন্থকার

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের ধারে যায় সে নিয়ে সিধে।
দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ,
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ পিতা ও মাতা

ইস্কুলের সকলেরই মুখে যেন একটা উৎকণ্ঠার চিহ্ন। সকলেই যেন একটা ভীষণ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। ছাত্রগণ ভাল পোশাক পরিয়া আসিয়াছে। শিক্ষকগণের পরিচ্ছদেও বিশেষত্ব আছে। নিত্যকার পরিধেয় যেমন সাদাসিধা, আজ ঠিক তেমনটি নয়। আজিকার পরিচ্ছদে যেন একটু দরবারী ভাব দেখা যায়। এক-একটি শ্রেণীতে এক-এক জন শিক্ষক প্রহরায় রত। ছেলেরা টুঁ-শব্দটি না করে সে দিকে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কেহ কেহ, ইনস্পেক্টর সাহেব আসিলে কিভাবে তাঁহার সংবর্ধনা করিতে হইবে তাহার প্রণালী শিখাইবার জন্য ব্যস্ত। কোনো কোনো শিক্ষক, কিরূপ প্রশ্ন করিলে কিরূপ উত্তর দিতে হইবে, ছেলেদের লইয়া তাহারই মহড়া দিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া মাঝে মাঝে দরজার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া আসিতেছেন। হেড মাস্টার মহাশয় আজ কোনো ক্লাসে যান নাই — শুধু মাঝে মাঝে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সচকিত করিয়া বারান্দার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করিতেছেন। নিজের ঘরে গিয়া এক-একবার চৌকিতে বসেন কিন্তু বেশীক্ষণ বসিতে পারেন না — এমনি অবস্থা।

যথাসময়ে ইনস্পেক্টর আসিলেন। ছেলেদের মধ্যে মৃদু

গুঞ্জন যেটুকু চলিতেছিল তাহাও থামিয়া গেল। শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয় জন দশেক ছেলেকে বাছিয়া বাছিয়া সামনের দুইটি বেঞ্চে বসাইলেন। দ্বিতীয় বেঞ্চের মাঝামাঝি নিতান্ত নিরীহ গোছের যে ছেলেটি বসিয়াছে সে বড় লাজুক। মাস্টার মহাশয়ের আশঙ্কা, ইনস্পেক্টরের প্রশ্ন শুনিলে ছেলেটি হয়তো ভয়ে এককে আর বলিয়া বসিবে। তাই তিনি মোহনকে বারবার উপদেশ দিতেছিলেন,—ভয় পাইয়ো না। ইনস্পেক্টর যাহাই জিজ্ঞাসা করুন ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিয়ো। দেখিয়ো যেন ক্লাসের নাম না ডুবে।

তথাপি নাম ডুবিল, শিক্ষকের এত আয়োজন এত উদ্‌যোগ এবং এত ব্যাকুলতা সব ব্যর্থ করিয়া মোহনদাস বানান ভুল করিয়া বসিল।

ইনস্পেক্টর সাহেব বানান পরীক্ষার জন্য পাঁচ-ছয়টি শব্দ লিখিতে দিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয়ের নির্বাচিত সব ভালো ছেলেই তাঁহার মুখ রাখিল, আর ওই মোহন! শিক্ষক মহাশয় দূর হইতে দেখিলেন সামনের সব-কয়টা ছেলেই শব্দগুলা ঠিক ঠিক লিখিয়াছে; মোহনও লিখিয়াছে। কিন্তু একটা শব্দ ভুল করিল যে। Kettle বানানটাও জানে না, k e ডবল t—ছেলেটা ওদিকে একটা t লিখিয়া বসিয়া আছে! একবার শিক্ষকের মুখের দিকেও যে তাকায় না। শিক্ষক মহাশয় তখন তাহার পাশাপাশি গিয়া জুতার ডগা দিয়া ইশারা করিয়া দিলেন। যত বড় বোকা ছেলেই হউক না কেন, নিশ্চয় বুঝিতে পারিত যে শিক্ষক মহাশয় পাশের ছেলের স্লেট দেখিয়া বানানটা শোধন

করিয়া লইতে বলিতেছেন, কিন্তু মোহন তাহা বুঝিতে পারিল না। শিক্ষক মহাশয় খুশী হইলেন না। ইনস্পেক্টর চলিয়া গেলে তিনি সে কথা খুব ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ওই নির্বোধ ছেলের বুদ্ধিবৃত্তির সংশোধন হইল না। পরের স্লেট দেখিয়া নকল করা—এই বড় বিদ্যাটা—সে সারা জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিল না, আয়ত্ত করিবার চেষ্টাও করিল না। শিক্ষক মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে ভাবিলেন, ছেলেটা শুধু বোকা নয়, অতিশয় গোঁয়ারও। কিন্তু গোঁয়ার ছেলেটিকে তিনি ভাল না বাসিয়া পারেন নাই। বালক মোহনদাসও শিক্ষক মহাশয়ের ক্ষণিক দুর্বলতার কথা মনে করিয়া রাখিলেন না। ইঁহার প্রতি গান্ধীজির ভক্তিশ্রদ্ধা বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। ছাত্রের চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া এই শিক্ষক মহাশয় ক্রমশই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু সে কথা যথাসময়ে বলিব। এখন গোড়ার কথা গোড়া হইতে বলি।

করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী ছিলেন দেশীয় রাজ্য পোরবন্দরের দেওয়ান। গান্ধীজির পিতামহ উত্তমচাঁদ গান্ধীও এক সময়ে এই রাজ্যে দেওয়ানি করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে যে জাতিকে গন্ধবণিক বলা হয়, গুজরাটে তাঁহারাই গান্ধী বলিয়া খ্যাত। গান্ধী (আসল বানান গন্ধী বা গংধী) শব্দের অর্থ গন্ধদ্রব্যের—অর্থাৎ মসলাপাতির—ব্যবসায়ী। কিন্তু এই পরিবার ব্যবসায়বৃত্তি অনেকদিন আগে হইতেই বর্জন করিয়াছিলেন।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সহিত এ পরিবারের বড় একটা

যোগ ছিল না। কাবা গান্ধী আজিকার অর্থে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতির নিকট হইতে, সংসারের নিকট হইতে, চতুষ্পার্শ্বস্থ মনুষ্যসমাজের নিকট হইতে তিনি যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার মূল্য ইংরাজী ইস্কুল-কলেজ হইতে লব্ধ বিদ্যা অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিল না। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। তাঁহার চরিত্রে কয়েকটি মহদ্‌গুণের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি উদারহৃদয়, তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ এবং স্বধর্মপ্রিয় ছিলেন। স্বার্থসাধনের জন্য কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন বহু বিপদ সহ্য করিয়াও তাহার পক্ষ লইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন।

কাবা গান্ধীর কর্মজীবনের শেষ অধ্যায় কাটে রাজকোটের দেওয়ানরূপে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাজকোট দরবার হইতে পেনশন পাইতেছিলেন। এই রাজকোটে দেওয়ানরূপে অবস্থান-কালে একবার পলিটিক্যাল এজেণ্টের এক সহকারী রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে অপমান করিলে কাবা গান্ধী তখনই তাহার প্রতিবাদ করেন। সাহেব তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কাবা গান্ধী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি তো অন্যায় কিছু করেন নাই, ক্ষমা চাহিবেন কেন? সাহেব অগ্নিশর্মা হইয়া তাঁহাকে হাজতে পাঠাইয়া দিলেন। হাজতবাস করিয়াও তিনি আপন নীতি হইতে বিচলিত হইলেন না। অপরাধও স্বীকার করিলেন না, ক্ষমাও চাহিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কাবা গান্ধীর অর্থ বিষয়ে আসক্তি একেবারেই ছিল না। তিনি অর্জন কম করেন নাই, কিন্তু সঞ্চয়ের পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল। বংশধরগণ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবন কাটাইতে পারিবে এমন ধনসম্পত্তি তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

কাবা গান্ধী আচারপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করার মত সুযোগ তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। ধর্মের গভীর তত্ত্ব লইয়া তিনি কখনো মাথা ঘামান নাই। সেকালে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে পথ ধরিয়া ধর্মসাধনা করিত তিনিও সেই সনাতন পথেরই পথিক ছিলেন। গৃহে নিত্য পূজা-পাঠের ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করিতেন, দেবতার পূজা দিতেন, কথকঠাকুরের মুখে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন। শেষ বয়সে তিনি গীতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন পূজার সময় গীতার কয়েকটি শ্লোক উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন।

জননী পুতলী বাঈয়ের স্মৃতি গান্ধীজির জীবনের একটি পবিত্র সম্পদ। আত্মজীবনীতে এই পুণ্যবতী রমণীর ধর্মচর্যা সম্পর্কে তিনি যে চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ তাঁহার উক্তি অনুসরণ করিয়া বলি,—

'মা যে সতীসাধ্বী ছিলেন সেই স্মৃতি আমার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। পূজা-পাঠ না করে অন্নগ্রহণ করতেন না। মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করা এবং পূজা দেওয়া তাঁর নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। আমার জ্ঞান হওয়ার পর তিনি কখনো চাতুর্মাস্য ব্রত ভঙ্গ করেছিলেন বলে

তো আমার মনে পড়ে না। দুশ্চর বহু ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন এবং নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করেছেন। যে ব্রত আরম্ভ করতেন পীড়িত হয়ে পড়লেও তা ত্যাগ করতেন না। আমার একবার-কার কথা মনে আছে। তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রত নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন তবু ব্রতভঙ্গ করেন নি। চাতুর্মাস্য ব্রতের সময় চার মাস এক বেলা আহার করে তিনি স্বচ্ছন্দে সব কাজ করেছেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে একবার তিনি একদিন অন্তর একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করেন চাতুর্মাস্য পালন করে। পর পর দু-তিন দিন উপবাস করা তাঁর কাছে কিছুই শক্ত ছিল না। একবার চাতুর্মাস্যের সময় তিনি সংকল্প করলেন সূর্যনারায়ণ দর্শন না করে আহার করবেন না। এই চার মাস আমরা কখন সূর্যদেব দেখা দেবেন এই আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। এ চার মাস অনেক সময়েই সূর্যের দেখা পাওয়া কঠিন এ তো সবারই জানা। একদিন আমার মনে আছে যে সূর্য দেখে আমি খুব উল্লসিত হয়ে মাকে ডাক দিয়ে বললাম,—মা মা সূর্য দেখা গেছে, সূর্য দেখা গেছে! শুনে মা বাইরে এলেন কিন্তু তাঁর আসার আগেই সূর্যদেব মেঘের আড়ালে লুকোলেন। মা বললেন,—না, আজ কপালে খাওয়া নাই। এই বলে তিনি ফিরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।'

পুতলীবাঈ যে কেবল পূজা-পাঠ ব্রত-উপবাস লইয়াই থাকিতেন তাহা নহে সুগৃহিণী হিসাবেও তাঁহার কর্মতৎপরতা কম ছিল না। তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধি ছিল প্রখর। রাজ-

দরবারের সকল খবরই তিনি রাখিতেন। রানীরাও তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন। বৈষয়িক দক্ষতায় পুতলীবাঈ স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন।

এই পিতামাতার কোলেই পোরবন্দরে গান্ধীজির জন্ম হয় ১৮৬৯ সালে, ২রা অক্টোবর তারিখে।

২ | প্রথম পাঠ

গান্ধীজি প্রথম যখন স্কুলে ভরতি হইলেন তখন তাঁহার বয়স বড় জোর ছয়। কেহ কেহ অনুমান করেন গান্ধীজির প্রথম পাঠ আরম্ভ হয় লুলিয়া মাস্টারের স্কুলে। মাস্টার মহাশয়ের আসল নাম বীরজি কামদার, কিন্তু ভদ্রলোকের চলার একটু দোষ ছিল বলিয়া তাঁহার 'লুলিয়া'—অর্থাৎ খোঁড়া—নামটাই লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। পোরবন্দরে ইস্কুল পাঠশালা আরও দুই-একটি ছিল কিন্তু লুলিয়া মাস্টারের স্কুল কাবা গান্ধীর বাড়ির কাছাকাছি ছিল বলিয়া গান্ধী পরিবারের ছেলেদের এখানেই পড়িতে পাঠানো হইত। লুলিয়া মাস্টারের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা যে খুব বেশী হইয়াছিল তাহা নহে। অক্ষরপরিচয়টা অবশ্যই হইয়াছিল। আর দল বাঁধিয়া সকল ছাত্র যে সুর করিয়া নামতা ডাকে তাহার সহিত গলা মিলাইয়া তিনিও কয়েক ঘর নামতা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই বিদ্যালয়ের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের পাঠও চলিতেছিল। গৃহে যিনি পড়াইতেন তাঁহার নাম তুলসীদাস অধ্বর্যু। পোরবন্দরের যুবরাজরাও ইঁহারই কাছে লেখাপড়া করিতেন।

ইস্কুলে নামতার সঙ্গে সঙ্গে দুই-চারিটা ছড়াও শেখা হইয়াছিল। সে-সব ছড়ার কাব্যরস খুব উচ্চগ্রামের নয়, তাহার

প্রধান কারণ ছড়াগুলির উদ্দিষ্ট নায়ক কোনো-না-কোনো মাস্টার মহাশয়। গান্ধীজি বলিয়াছেন,—

'সেই সময় অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে মাস্টারমশায়ের নাম করে অশিষ্ট কথা বলতে শিখেছিলাম—এটুকু মনে আছে। আর-কিছুই মনে নাই। তাই অনুমান করি আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না এবং স্মরণশক্তিও—কাঁচা পাঁপরের যে ছড়া গাইতাম তার মতই—কাঁচা ছিল।'

উক্ত ছড়ার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া গান্ধীজি যে সুরসাল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা মনে রাখিবার মত।

এক রে এক।
পাঁপর সেঁক॥
পাঁপর কাঁচা।
—আমার—॥

শেষ ছত্রে যে দুইটি ফাঁক আছে তাহার প্রথমটিতে বসিত শিক্ষকের নাম এবং দ্বিতীয়টিতে যে শব্দ বসিত তাহা স্বভাবতই সভ্যসমাজের অনুমোদিত নহে। গান্ধীজি বলিয়াছেন,—

'প্রথম ফাঁকের স্থান যে মাস্টারের নাম দিয়ে পূর্ণ করা হত তাঁকে আমার অমর করার ইচ্ছা নেই—আর দ্বিতীয় ফাঁকটিও, যে অশালীন কথা ছেড়ে দিয়েছি তা দিয়ে, পূরণ করার আর দরকার দেখি না।'

পোরবন্দর হইতে কাবা গান্ধীর পরিবারবর্গ রাজকোটে চলিয়া যান ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে। কাবা গান্ধী দুই বছর

আগে হইতেই নূতন কর্মসূত্রে পোরবন্দর ছাড়িয়া রাজকোটে অবস্থান করিতেছিলেন। বালক মোহনদাস রাজকোটে আসিয়া কোন্ ইস্কুলে ভরতি হইয়াছিলেন আজ তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে অনুমান করা যায় প্রধান তালুক (প্রাথমিক) বিদ্যালয়ের যে শাখাটি কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহাদের রাজকোট আবাসের নিকটেই খোলা হইয়াছিল সেখানেই দুই বৎসর কাল তাঁহার পড়াশোনা হয়। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুজরাটী প্রথম ও দ্বিতীয় মানের পাঠ শেষ করিয়া তিনি প্রধান তালুক বিদ্যালয়ের গুজরাটী তৃতীয় মানে প্রবিষ্ট হন। তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর তিন মাস। প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবেশের তারিখ ২১ জানুয়ারি ১৮৭৯।

ক্লাসের পড়ায় বালক গান্ধীজি তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। শাখা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মাসের শেষ পরীক্ষায় তিনি এক বিষয়ে ফেল করিয়াছিলেন। তথাপি নূতন ইস্কুলে তাঁহাকে তৃতীয় মানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও ছিলেন ইস্কুল-পালানো ছেলে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কেবল এই পার্থক্য যে, অনিচ্ছার জন্য ইস্কুল কামাই করিলেও অস্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে কখনো ছুটি লইতে হয় নাই। কিন্তু গান্ধীজির স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তিনি প্রায়ই অসুখে ভুগিতেন। ফলে পরীক্ষাতে তিনি আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। আর ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যাও নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। দুই-শ আটত্রিশ দিন ক্লাস হইয়াছিল, তিনি মাত্র এক-শ দশ দিন ক্লাসে আসিয়াছিলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় মানের পাঠক্রম নিতান্ত হালকা ছিল না। এ যুগের ছেলেমেয়েরা অনুরূপ শ্রেণীতে কি পড়ে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য গান্ধীজির তৃতীয় মানের পাঠ্যবিষয়ের একটি তালিকা তুলিয়া দিলাম।

১. পাটীগণিত — ৫০ নম্বর

পাটীগণিত শিক্ষার জন্য সপ্তাহে দশ ঘণ্টা করিয়া নির্দিষ্ট ছিল। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং লঘুকরণ শিখিতে হইত। ইহার সহিত পুরাতন পাঠের পুনরালোচনাও করিতে হইত। সরল মানসাঙ্কও পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। টাকাকড়ি, ওজন, দৈর্ঘ্য, দূরত্ব প্রভৃতি বিষয়ক দেশীয় পরিমাণ-তালিকাও এই মানের শিক্ষণীয় ছিল।

২. গুজরাটী — ৫০ নম্বর

গুজরাটী শিক্ষার জন্যও সপ্তাহে দশ ঘণ্টা দেওয়া হইত। শিক্ষাবিভাগের সম্পাদিত একটি গুজরাটী সংকলন-পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল। পাঠ্যাংশের সরলার্থ, শব্দার্থ, পদপরিচয় প্রভৃতি শিখিতে হইত এবং কবিতাও কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করিতে হইত।

৩. শ্রুতিলিখন — ৫০ নম্বর

পাটীগণিত ও গুজরাটীর মত শ্রুতিলিখনের জন্যও সপ্তাহে দশ ঘণ্টা নির্দিষ্ট ছিল। পাঠ্য বই হইতে শিক্ষক মহাশয় দুই-একটি বাক্য ধীরে ধীরে পাঠ করিবেন এবং ছাত্র তাহা

শুনিয়া শুনিয়া আপন খাতায় বা স্লেটে লিখিবে। এই ভাবে লেখা অভ্যাস করানো হইত।

৪. ইতিহাস ও ভূগোল — ৫০ নম্বর

এ বিষয়টির জন্য সপ্তাহে তিন ঘণ্টা মাত্র নির্দিষ্ট ছিল। ভূগোলের বিষয়বিভাগ এইরূপ :— ভূগোলের সংজ্ঞার্থ, প্রেসিডেন্সির ভূগোল, সন্নিহিত প্রদেশসমূহের পাহাড়-পর্বত, নদনদী, দেশীয় রাজ্য, জেলা, শহর, বন্দর ইত্যাদি মানচিত্রে প্রদর্শন। ভূগোল প্রসঙ্গেই ইতিহাস অল্পস্বল্প আলোচিত হইত।

উল্লিখিত পাঠক্রম অনুসারে তৃতীয় মানের শেষে যে বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইল তাহাতে মোহনদাসের কিছুটা উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি চারিটি বিষয়েই পাস করিলেন, তবে নম্বর বেশী উঠিল না। ২০০ নম্বরের মধ্যে মোট নম্বর পাইলেন ৮২.৫, শতকরা ৪১.২৫। তাঁহার মানের যে ছেলেটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল সে পাইয়াছিল ২০০-র মধ্যে ১৫৩। তৃতীয় মানের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়াছিল সর্বসুদ্ধ ৬৭ জন ছাত্র, ইহাদের মধ্যে যে কয়জন চারি বিষয়েই পাস করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ৪৮। গুণানুক্রমে গান্ধীজির স্থান হইয়াছিল ৪৭তম।

এইভাবে তিনি কোনো রকমে পাস করিয়া চতুর্থ মানে উঠিলেন। চতুর্থ মানের পাঠক্রমও অনেকটা তৃতীয় মানেরই মত। চতুর্থ মানেও বিষয়বিভাগ ছিল চারিটিই : ১. পাটীগণিত ২. গুজরাটী ৩. শ্রুতিলিখন এবং ৪. ইতিহাস ও ভূগোল।

তৃতীয় মানে ৫০ করিয়া সর্বসুদ্ধ ২০০ নম্বর নির্দিষ্ট ছিল, চতুর্থ মানে হইল ১০০ করিয়া ৪০০ নম্বর। শিক্ষাদানের সময় সমানই রহিল, সপ্তাহে ৩৩ ঘণ্টা।

চতুর্থ মান হইতে বোধ হয় গান্ধীজি লেখাপড়ায় একটু মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্থ মানের বার্ষিক পরীক্ষার ফল পূর্ব বৎসর অপেক্ষা কিছুটা ভালো হইল। এই মানে পরীক্ষা দিয়াছিল ৫৪ জন ছাত্র, তাহার মধ্যে ৩২ জন সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়। এই ৩২ জনের মধ্যে গান্ধীজি ২১শ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নম্বরও উঠিয়াছিল পূর্ববৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী। এবার তিনি পান শতকরা ৫৩·৫ নম্বর। এক বৎসরের মধ্যে যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৩ | উচ্চ বিদ্যালয়ের পালা শুরু

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার বৎসরের পাঠ শেষ হইল। এবার উচ্চ বিদ্যালয়ের পালা।

সেকালে ছাত্রসংখ্যা যেমন কম ছিল, বিদ্যালয়ের সংখ্যাও তেমন বেশী ছিল না। ফলে স্কুলে ভর্তি হওয়া এখনকার মতই দুরূহ ছিল। প্রাথমিক চতুর্থ মানের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পাইত না। ইহাদের মধ্যে যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চাহিত তাহাদের জন্য সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। এই পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইত কেবল তাহারাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এই নির্বাচনী পরীক্ষাটি নিতান্ত সহজ ছিল না। পরীক্ষণীয় প্রত্যেকটি বিষয়েই পাস-নম্বর না রাখিলে মোট নম্বর বেশী থাকিলেও পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইত না। এক-একটি বিষয় আবার কয়েকটি বর্গে বিভক্ত ছিল। যেমন,—পাটীগণিতের প্রথম বর্গ লিখিত পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় বর্গ মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় ৬০ নম্বরের এবং মৌখিক পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের প্রশ্ন উত্তর করিতে হইত। লিখিত ও মৌখিক উভয়

বর্গে মিলাইয়া শতকরা ৩৩ ছিল পাস-নম্বর। কিন্তু তাই বলিয়া একটি বর্গে ৩৩ বা ততোধিক নম্বর রাখিয়া অন্য বর্গে শূন্য পাইলে পাস ধরা হইত না। প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি বর্গে শতকরা অন্তত ২৫ নম্বর পাওয়া পাস করার পক্ষে আবশ্যিক বলিয়া ধার্য ছিল।

গান্ধীজি নির্বাচনী পরীক্ষা দেন ১৮৮০ সালের নভেম্বর মাসে। সর্বসুদ্ধ ৬৯ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসিয়াছিল। সকল বিষয়ে পাস করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল মোটে ৩৮ জন। গান্ধীজি ৪০০ নম্বরের মধ্যে ২৫৭ পাইয়া উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেন। দেখা যাইতেছে প্রাথমিক দ্বিতীয় মানের পর হইতে তিনি লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন এবং তাঁহার পরীক্ষার ফল ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হইতেছে।

সিটি তালুক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ববিষয়ে উত্তীর্ণ ৩২টি ছেলের মধ্যে গান্ধীজি যে ২১শ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে কথা আগে বলিয়াছি। সিটি তালুক স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুল হইতে এই ৩২ জন ছাত্রের মধ্যে ৩০ জনকেই নির্বাচনী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই ৩০ জনের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষায় যত জন পাস করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে গান্ধীজির স্থান ছিল ষষ্ঠ। বার্ষিক পরীক্ষা ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল আর নির্বাচনী পরীক্ষা হয় নভেম্বরে। এই দুই মাসের মধ্যেই এতখানি উন্নতির অন্তরালে যে সাধনা যে অধ্যবসায় এবং দৃঢ়চিত্ততার নিদর্শন পাওয়া যায়

তাহার তাৎপর্য প্রণিধানযোগ্য। যে মহাত্মা গান্ধী একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে 'করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে' এই নবীন গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহারই আবির্ভাবের পূর্বাভাস বালকের পরীক্ষা-পাঠপ্রস্তুতির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কঠোর সাধনা ব্যতীত কোনো পরীক্ষাই সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না— গান্ধীজির জীবন হইতে এই মহৎ শিক্ষাটি আমরা লাভ করিয়াছি। সে শিক্ষা যদি কাজে লাগাইতে অক্ষম হইয়া থাকি সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করিয়া বালক গান্ধীজি রাজ-কোটের কাঠিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

প্রথম শ্রেণীর দুইটি বিভাগ ছিল। গান্ধীজি বি সেকশনে স্থান পাইয়াছিলেন, এই সেকশনের শ্রেণী-শিক্ষক ছিলেন নাগজি নাথু গনত্র। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া ইনি শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ করেন। যে বিদ্যালয়-পরিদর্শনের ঘটনা দিয়া জীবনপ্রভাতের ভূমিকা করিয়াছিলাম, সে ঘটনা এই নাগজি নাথুর শ্রেণীতেই ঘটিয়াছিল। ইঁহারই নির্দেশিত ভুল সংশোধনের সংকেত অমান্য করিয়া গান্ধীজি ইঁহারই ভুল চির-দিনের জন্য সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নির্বাচনী পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভরতি হইলেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম টার্ম-এ বালক গান্ধীর পড়াশোনায় আবার কিছু বাধা পড়িল। বৎসরের প্রথমার্ধে আটাত্তর দিন

ক্লাস হইয়াছিল, তিনি সর্বসুদ্ধ বাইশ দিনের বেশী ক্লাস করেন নাই। অসুস্থতাই এই অনুপস্থিতির কারণ বলিয়া অনুমান হয়। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফল খুবই খারাপ হইল। গণিতে ও গুজরাটীতে পাস করিলেন বটে, কিন্তু ইতিহাস-ভূগোলে একেবারে শূন্য। ইতিহাস-ভূগোলে তিনি বরাবরই কাঁচা ছিলেন, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষের দিকে পরিশ্রমের দ্বারা অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। আর এক নূতন বিপদ আরম্ভ হইল ইংরাজী লইয়া। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী হইতে ইংরাজী পাঠ আরম্ভ। প্রথম টার্মের শেষে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরাজীরও পরীক্ষা লওয়া হইল। গান্ধীজি তাহাতেও পাস করিতে পারিলেন না।

প্রত্যেক টার্মের শেষে অভিভাবকের কাছে ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফলাফল এবং শ্রেণী-শিক্ষকের মন্তব্যসহ একটি প্রগতি-পত্র পাঠাইবার রীতি ছিল। গান্ধীজির পিতার কাছেও গান্ধীজি সম্পর্কে এরূপ প্রগতিপত্র পাঠানো হইয়াছিল তাহাতে স্বাক্ষর ছিল শ্রেণী-শিক্ষক গনত্রের।

স্বভাব-চরিত্রের কলমে তিনি বালক মোহন সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন 'অতি উত্তম' (very good)। গনত্র বালকের ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'অতি উত্তম' এই মন্তব্যটি সত্যসন্ধ ছাত্রের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে গুণগ্রাহী উদার-হৃদয় শিক্ষকের অকপট স্বীকৃতি।

প্রথম শ্রেণীর প্রথম পরীক্ষার শোচনীয় ফলাফল দেখিয়া গান্ধীজির চৈতন্য হইল। তিনি আবার পড়াশোনায় নূতন করিয়া

মন দিলেন। পরে তাহার ফলও ফলিল। বার্ষিক পরীক্ষায় আশ্চর্য রকমের উন্নতি হইল। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় তাঁহার সেকশনের চৌত্রিশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে গুণানুসারে তাঁহার স্থান হইয়াছিল ৩২শ। আর বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে শতকরা ৬৩ নম্বর পাইয়া দুই সেকশনের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। ভূগোলে পাইলেন শতকরা ৬০, ইংরাজীতে নম্বর উঠিল আরও বেশী।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের শেষে বালক গান্ধীজি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পূর্বে শ্রীমতী কস্তুরবা-র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর কয়েক মাস, তের তখনও পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের জন্য পড়াশোনার ব্যাঘাত হইলেও ১৮৮২-র ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফল খারাপ হয় নাই। এই পরীক্ষায় তিনি গড়পড়তা শতকরা ৫৭ নম্বর পাইয়া তাঁহার সেকশনের সকল ছাত্রের মধ্যে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন।

গান্ধীজির পিতা এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হন। স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসকরা তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়ায় তিনি কিছুদিনের জন্য সপরিবারে পোরবন্দরে যান। মোহনদাস স্কুল হইতে ছুটি লইয়া পিতার সহিত পোরবন্দর গেলেন।

বার্ষিক পরীক্ষা আর দেওয়া হইল না। বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে বোধ হয় তিনি পোরবন্দর হইতে ফিরিতে পারেন নাই। সারা বছরের উপস্থিতির হিসাব দেখিয়া সেই রকমই মনে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঠন-পাঠন হয় ২২২ দিন, গান্ধীজি মাত্র ৭৪ দিন ক্লাস করেন। কাজেই সে বছর তিনি প্রমোশন পাইলেন না। প্রমোশন পাইল না আর-একটি ছেলে, তাহার নাম শেখ মেহ্‌তাব—গান্ধীজির জীবনের এক দুষ্টগ্রহ। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

৪ | বিদ্যালয়ের বাহিরে

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোনো বই পড়িবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। বই পড়ার অভ্যাস তাঁহার বেশী ছিল না। ইস্কুলের নির্দিষ্ট বইগুলি অবশ্য না পড়িয়া উপায় ছিল না। কিন্তু যে মন বিরোধী, তাহাকে বাগ মানাইয়া পুঁথির বন্দীশালায় আবদ্ধ করাও দুরূহ হইয়া উঠিত। ফলে ইস্কুলের পড়া শেষ করিতেই সময় লাগিত প্রচুর, অতিরিক্ত পাঠের অবসর হইত না। এই সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন,—'বিদ্যাভ্যাসের সময় আমি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছুই পড়ি নি বলা যায়। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পরও খুব কমই পড়েছি।'

স্কুলের পড়াও এমনি ভাবে চলিতেছিল, ইতিমধ্যে গান্ধীজি পিতা কাবা গান্ধীর ক্রীত একখানি পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পুস্তকটির নাম 'শ্রবণের পিতৃভক্তি নাটক'। শিরোনাম দেখিয়াই বুঝা যায়, উহা নাটকাকারে গ্রথিত একটি ধর্মবিষয়ক উপাখ্যান। এই পৌরাণিক কাহিনী বালকের কোমল মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই একদল ব্যবসায়ী ছবি দেখাইবার নিমিত্ত রাজকোটে আসে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লণ্ঠন-ছবি দেখানোই ইহাদের ব্যবসা। গান্ধী-পরিবারেও ইহারা একদিন ছবি দেখাইতে

আসিল। বালক গান্ধী অনেক ছবি দেখিলেন। ইহাদের প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে শ্রবণের পিতৃভক্তিবিষয়ক কয়েকটি চিত্র ছিল। একটি ছবি ছিল, ঝোলনার মধ্যে বসাইয়া এবং তাহা কাঁধে ঝুলাইয়া শ্রবণ পিতামাতাকে তীর্থে তীর্থে লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই ছবিটি দেখিয়া বালক গান্ধী মুগ্ধ হইলেন। পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি ও ভালবাসা কতটা গভীর এবং কিরূপ দৃঢ়নিষ্ঠ হইতে পারে শ্রবণের চরিত্র বালক গান্ধীর সম্মুখে তাহারই এক মহান মহিমময় আদর্শ স্থাপন করিল। গান্ধীজি স্বীয় জীবনে সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই, যদি কখনো হইয়া থাকেন তো তাহার প্রায়শ্চিত্তও কম করেন নাই। যাহাই হউক, পরিশেষে যবনিকা পতনের পূর্বে ছায়াচিত্রের অন্তিম দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল—শ্রবণের মৃত্যু। গায়কদল শ্রবণের পিতামাতার হইয়া করুণ সুরে বিলাপ করিয়া উঠিল। সুরযন্ত্রের মিড়ে মূর্ছনায় বাদ্যকার সেই শোকসংগীতকে অধিকতর সকরুণ, অধিকতর মর্মস্পর্শী করিয়া তুলিল।

শিশুর অপরিণত অন্তর রঙ্গমঞ্চবিশেষ—সেখানে যে-কোনো অভিনয় চলিতে পারে। ছবির ব্যবসায়ী অবশ্য সেইদিনই চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু শিশুচিত্তে শ্রবণের পিতৃভক্তির অভিনয় ইহার পরেও বহুবার হইয়া গিয়াছে। শোকগাথার অনুবর্তী সেই করুণ সুরটি বাজাইয়া শুনাইবার নিমিত্ত বালক মোহন পিতার নিকট হইতে একটি সুরযন্ত্র উপহার পাইয়াছিলেন।

সমসাময়িক আর-একটি ঘটনায় বালকের চিত্ত আন্দোলিত

হইয়া উঠে। রাজকোটে তখন 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয় চলিতেছিল, পুত্র পিতার অনুমতি লইয়া অভিনয় দেখিতে গেলেন। এই ত্যাগবীর বলিষ্ঠহৃদয় পৌরাণিক নরপতির কাহিনী 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' অপেক্ষাও তাঁহার মনকে আরও গভীরভাবে অধিকার করিয়া বসিল। বাড়ি ফিরিবার পথে নিজেকে বারংবার প্রশ্ন করিলেন — আমরা সকলেই হরিশ্চন্দ্রের মত হইতে পারি না ? এই অভিনয়টি আরও দেখিবার সাধ ছিল, কিন্তু পায়ে যাহার শিকল বাঁধা, অনুমতি না পাইলে সে পাখী উড়িতে পারে না। বালকের সে সাধ আর মিটিল না। ফলে মনের পটভূমিকায় ইচ্ছামত ইহার অভিনয় চলিতে লাগিল। তাহাতে সুবিধা হইল এই যে, নায়কের অংশটা তাঁহার নিজের হাতেই রহিয়া গেল।

ইস্কুলের পড়ায় আকর্ষণযোগ্য কিছুই পাইতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। শিক্ষকগণ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ইস্কুল হইতে প্রতি বৎসর পড়াশুনা এবং চরিত্র সম্বন্ধে অভিভাবকের নিকট বিবৃতি পাঠানো হইত। তাহাতে প্রতিকূল মন্তব্য কোনোদিন আসে নাই।

ইস্কুলজীবনে গান্ধীজি একবার শিক্ষকের হস্তে প্রহৃত হন। প্রহারটা তেমন বাজে নাই — কিন্তু এই চিন্তাটাই তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল যে শাস্তির যোগ্য না হইলে মানুষ শাস্তি পায় না। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যক্ষের মত সতর্ক ছিলেন, এই ক্ষুদ্র ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দোরাবজি এদুলজি গীমী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষণীয়

বিষয়টিকে সহজ সরল করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। ছাত্রমহলে তাঁহার সুনাম ছিল, তিনি নিয়ম করিলেন—উচ্চ মানের ছাত্রদিগকে ব্যায়াম ও ক্রিকেট খেলায় আবশ্যিকভাবে যোগদান করিতে হইবে। এই দুইটি বিষয়ের প্রতি মোহনদাসের আশৈশব বিরাগ। দীর্ঘ ভ্রমণের দ্বারা তিনি ইহার অভাব পূর্ণ করিতেন। তাহার কিছু কারণও ছিল। একে তো লাজুক স্বভাব সঙ্গীসাথীদের সহিত মেলামেশার পথে প্রায়ই অন্তরায়ের সৃষ্টি করিত, তাহাতে আবার ইস্কুল হইতে ফিরিয়া রুগ্‌ণ পিতার সেবায় নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং এই নিয়মে তিনি খুশী হইলেন না। পরে অবশ্য ইস্কুলের পর অসুস্থ পিতার সেবা-শুশ্রূষা করা আবশ্যক, এই মর্মে চিঠি আনিয়া ব্যায়ামের রুটিন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু আপাতত আইন না মানিয়া উপায় নাই।

পিতার শুশ্রূষা করিয়া একদিন খেলার মাঠে পৌঁছিতে তাঁহার দেরি হইয়া গিয়াছিল। এজন্য দু-আনা না এক আনা জরিমানা হইয়াছিল। আর্থিক হিসাবে এক আনা দুই আনা নগণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই বালকের কাছে আথিক মূল্যটাই মুখ্য ছিল না। তিনি বুঝিলেন এক আনা দিলেও দণ্ড স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। অথচ দণ্ডযোগ্য অপরাধ তো তিনি করেন নাই। কেন দণ্ড গ্রহণ করিবেন? তিনি জরিমানা দিলেন না। অবশেষে শিক্ষক মহাশয় সব শুনিয়া শাস্তির আদেশ তুলিয়া লন।

শৈশবে গান্ধীজির একটি ত্রুটি ছিল—অপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর।

আজ পর্যন্ত সেজন্য তিনি দুঃখ করেন। কেমন করিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শিক্ষার উন্নতির সহিত সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরের সম্পর্ক খুব নিবিড় নয়। কর্মজীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার এই ভুল ভাঙিয়াছিল। সেখানে স্বীয় অপরিণত হস্তাক্ষরের সহিত সহকর্মীদের মুক্তার মত হস্তাক্ষরের তুলনা করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইতেন। খারাপ হস্তাক্ষরের কথা ভাবিয়া তিনি যে বেদনা অনুভব করিয়াছেন আত্মকথায় তাহার পরিচয় আছে। গান্ধীজি বলিয়াছেন,—

'আমি বেশ বুঝতে পারলাম খারাপ হাতের লেখা অসম্পূর্ণ শিক্ষার চিহ্ন বলে গণ্য করা উচিত। আমি তারপর হাতের লেখা ভাল করবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু শুকনো বাঁশ কি আর বাঁকানো যায়? প্রথম জীবনে যা অবহেলা করেছি — তা আর সংশোধন করতে পারি নি। আমার দৃষ্টান্ত দেখে সব ছেলে মেয়ে যেন এটা উপলব্ধি করতে পারে যে ভাল হস্তাক্ষর বিদ্যাশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। হাতের লেখা ভাল করতে হলে প্রত্যেকটি অক্ষরের গঠনকৌশল শিখতে হবে। আমার তো এই ধারণা হয়েছে যে লিখতে শেখার আগে আঁকতে শেখা দরকার। যেমন পাখী বা অন্য কোনো জিনিস দেখে সেটা মনে রেখে ছেলেরা তা আঁকতে শেখে তেমনি প্রথমে অক্ষর চিনে তারপর ছবি আঁকার মতো করে ছেলেদের অক্ষর আঁকা শেখা উচিত।'

গান্ধীজির এই মন্তব্য সেদিন যেমন সত্য ছিল আজও তেমনি সত্য আছে, এ কথা যেন আমরা মনে রাখি।

৫ | ডবল প্রমোশন

কাবা গান্ধী নষ্ট স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। শরীরের জন্য তিনি রাজকোটের দেওয়ানের পদ হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার চলাফেরা বন্ধ হইল, দীর্ঘকাল শয্যাগত রহিলেন। মোহনদাস পিতার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি খেলাধুলায় তাঁহার মন ছিল না, পিতার অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকালে ঘরের বাহির হওয়াও প্রায় বন্ধ হইল।

তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন না পাইয়া গান্ধীজি ১৮৮৩ সালটা দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠই পড়িয়া চলিলেন। গত বৎসরের অসাফল্যের আঘাত তাঁহাকে যে বিচলিত করিয়াছিল এবারকার টার্মিনাল পরীক্ষার রিপোর্ট হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল বিষয়েই তাঁহার লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেল। গুজরাটীতে শতকরা ৬৪ এবং ইংরাজীতে শতকরা ৮৪ নম্বর পাইলেন। সকল বিষয়ের সম্মিলিত নম্বরও ছিল শতকরা ৬৬'৫। বার্ষিক পরীক্ষায় এই নম্বরই বাড়িয়া শতকরা ৬৮ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বৎসরের শেষে তিনি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও পূর্ণ উদ্যমে পড়াশোনা চালাইয়া

যাইতে থাকিলেন। এই শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক ছিলেন নাগজী নাথু গনত্র। ইহার সহিত পূর্বেই আমাদের পরিচয় হইয়াছে। বানান পরীক্ষার ঘটনার পর হইতেই নাগজী এই আদর্শনিষ্ঠ ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁহাকে শ্রেণী-শিক্ষক পাওয়ায় লেখাপড়ায় গান্ধীজির নিশ্চয় অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

মুরারজি মঙ্গলজি নামে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক গান্ধীজিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রমোশন না পাওয়ায় গান্ধীজির যে একটা বৎসর অনর্থক নষ্ট হইল ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। গান্ধীজি পরীক্ষা দিলে যে পাস করিতেন এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। পিতার অসুখের জন্য তাঁহাকে ছুটি লইয়া পোরবন্দরে যাইতে হইয়াছিল, ছয় মাসেরও অধিককাল তিনি ক্লাসে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। যখন বার্ষিক পরীক্ষা হয় তখন সম্ভবত তিনি রাজকোটেই ছিলেন না। ওই বৎসর পড়াশোনার যে ক্ষতি হইয়াছিল সে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নয়। এই সব বিবেচনা করিয়া মুরারজি গান্ধীজিকে বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে তৃতীয় শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে তুলিয়া দিবার জন্য প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করিলেন।

দোরাবজি এতুলজি গীমী তখন প্রধান শিক্ষক। ছাত্রদের লেখাপড়ার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সজাগ ও সদাসতর্ক। পুরাপুরি পাস-নম্বর না পাইলে তিনি কখনো কাহাকেও ক্লাসে

উঠিতে দিতেন না। ডবল প্রমোশনের কথা তো তিনি কানেই তুলিতে চাহিলেন না। শেষে স্থির হইল গান্ধীজি যদি তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম টার্মিনাল পরীক্ষার সময় চতুর্থ শ্রেণীর টার্মিনাল পরীক্ষাও দিতে পারেন এবং উভয় পরীক্ষাতেই ভাল নম্বর পাইয়া পাস করেন তাহা হইলে বৎসরের মাঝখানেই তাঁহাকে চতুর্থ শ্রেণীতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। গান্ধীজি সে আহ্বান গ্রহণ করিয়া তৃতীয় এবং চতুর্থ উভয় শ্রেণীর পাঠ্য পড়িয়া উভয় শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। টার্মিনাল পরীক্ষাটা হইত গ্রীষ্মের ছুটির আগে, সাধারণত এপ্রিল মাসে। বৎসরের ঠিক মাঝামাঝি এ পরীক্ষা লওয়া হইত না, তবু আমরা এই গ্রন্থমধ্যে এই পরীক্ষাকে কখনো কখনো ষাণ্মাসিক পরীক্ষা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

যথাসময়ে গান্ধীজি পরীক্ষা দিলে, পরপর দুই শ্রেণীর পরীক্ষাই দিলেন। ফল কোনোটিরই খারাপ হইল না। তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় তিনি গড়পড়তা শতকরা ৫৮ নম্বর পাইলেন। চতুর্থ শ্রেণীর ফল এতটা ভাল না হইলেও খুব খারাপ হয় নাই। অঙ্ক ব্যতীত আর তিনটি বিষয়েই তিনি গড়পড়তা শতকরা ৫০ নম্বর পান। কেবল অঙ্কে তিনি পাস করিতে পারেন নাই। সামগ্রিক ভাবে তিনি যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া প্রধান শিক্ষক গান্ধীজিকে বৎসরের মধ্যভাগেই চতুর্থ শ্রেণীতে উঠাইয়া দিলেন।

প্রমোশন তো হইল কিন্তু বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি

যখন চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া বসিলেন তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। শিক্ষক মহাশয়দের ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে। চতুর্থ শ্রেণী হইতেই তখন পঠনপাঠনের বাহন ছিল ইংরাজী। ইংরাজীর মাধ্যমে সব বিষয় বোঝা সহজ ছিল না। তাহা ছাড়া জ্যামিতিও আরম্ভ হইল এই শ্রেণীতে। একে তো বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন তাহাতে আবার বিদেশী ভাষায় লেখা, শিক্ষক মহাশয় পড়াইতেও আরম্ভ করিলেন ওই বিদেশী ভাষায়। বালক যেন অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ইউক্লিডের ত্রয়োদশ প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত পৌঁছিতে তাঁহার পরিশ্রমের অবধি ছিল না, কিন্তু তাহার পরেই কূল দেখিতে পাইলেন। এইখানে আসিয়াই তিনি জ্যামিতির মূল সূত্রটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। গান্ধীজি বলিয়াছেন,

'তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম জ্যামিতি অন্যসব বিষয়ের চেয়ে সহজ। যেখানে কেবল বুদ্ধিরই সহজ এবং সরল প্রয়োগ, সেখানে আর অসুবিধা কোথায়? তারপর থেকে জ্যামিতি আমার কাছে সহজ এবং চিত্তাকর্ষক বিষয় হয়ে উঠল।'

জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান হইল বটে, কিন্তু নূতন সমস্যা বাধিল সংস্কৃত লইয়া। সংস্কৃতশিক্ষাও আরম্ভ হইত এই চতুর্থ শ্রেণী হইতে। সংস্কৃত এবং ফারসীতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা চলিত।

মুসলমান রাজত্বের ফলে ফারসী ভাষা এক সময়ে ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে ফারসী ভাষা বিশেষ সমাদৃত হইত। আজ ইংরাজী ভাষার যে স্থান

ইংরাজ আসিবার পূর্বে ফারসী ভাষা ভারতবর্ষে প্রায় সেই স্থান অধিকার করিয়া ছিল। ইংরাজ আসিবার পরেও তাহার প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল; তবে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে যতদিন ছিল বাংলায় ততদিন ছিল না। রামমোহন ফারসী শিখিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ফারসী জানা ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্কুলে বা গৃহে ফারসী পড়েন নাই। বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা ফারসী শিখিতেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে কোনো বাঙালী হিন্দু ছাত্র বাংলাদেশের কোনো স্কুলে সংস্কৃতের বিকল্প হিসাবে ফারসী পাঠ করার কথা চিন্তা করিত না।

গান্ধীজির স্কুলে দুই ভাষাই পড়ানো হইত। সংস্কৃত ও ফারসী দুই ভাষাই কাহাকেও একসঙ্গে পড়িতে হইত না। দুইয়ের মধ্যে যে-কোনো একটি বাছিয়া লইতে হইত। গান্ধীজি সংস্কৃতই লইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত তাঁহার খুব কঠিন বোধ হইত। যতটুকু পারেন মুখস্থ করিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত পড়াইতেন কৃষ্ণশংকর হরিশংকর পাণ্ড্য। তিনি ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ এবং কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক। ছাত্ররা যাহাতে সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে সেজন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য ছাত্রদের ভয়ের কারণ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যেমন নিজে খাটিতেন তেমনি ছাত্রদেরও খাটাইয়া লইতেন। পড়া আদায় না করিয়া ছাড়িতেন না। সকল ছাত্রকেই তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত করিয়া তুলিবেন এই ছিল

তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা। কাজেই সংস্কৃত যাহারা লইত তাহাদের পড়ার চাপটা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত।

ওদিকে ফারসী শিক্ষক নান্নু মিঞা ছাত্রদের ক্ষমতা বুঝিয়া চলিতেন। ছেলেরা যতটুকু পড়া করে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। ছাত্রসমাজে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে ফারসী ভাষাটাও মৌলভী সাহেবের মেজাজের মতই কোমল। এই ধারণা কতটা সত্য তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গান্ধীজিও একদিন ফারসী ক্লাসে যোগদান করিলেন। সংস্কৃতের পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুব্ধচিত্তে তাহা লক্ষ্য করিলেন। একান্তে ডাকিয়া তাঁহার বংশমর্যাদার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—তিনি যে পবিত্র বৈষ্ণববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সে-বংশের সন্তান হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সংস্কৃত এখন কঠিন বোধ হইলেও ভবিষ্যতে ইহার মধ্যে অফুরন্ত আনন্দের উৎস মিলিবে, উৎসাহ হারাইবার কিছুমাত্র হেতু নাই। নূতন নূতন শিক্ষায় অসুবিধা হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু প্রয়োজনমত সাহায্য করিতে তিনি তো পরাঙ্মুখ নন।

শিক্ষকের এই স্নেহপূর্ণ উপদেশ গান্ধীজি অমান্য করেন নাই। আত্মকথায় এই শিক্ষকের নাম তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তখন যেটুক সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন সেটুকুও যদি না শিখিতেন তাহা হইলে আজ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যে রস পাইতেছেন তাহা পাওয়া সম্ভব হইত না। তিনি বুঝিয়াছিলেন কোনো হিন্দু বালকেরই সংস্কৃত না জানিলে চলে

না। হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দুর সভ্যতা হিন্দুর আচার ধর্ম শিল্প-বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসের উপাদান নিহিত আছে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে। সংস্কৃত না শিখিলে হিন্দুর পক্ষে আত্মপরিচয় লাভ করাই অসম্ভব হইবে।

৬ : প্রবেশিকার প্রস্তুতি

১৮৮৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধীজি ওই বৎসর ডিসেম্বর মাসে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকমাস মাত্র পড়িবার সময় পাইয়াছিলেন, তাহাও আবার ইংরাজীর মাধ্যমে। বাড়িতে আসিয়াও পড়িবার সময় মিলিত না। ইস্কুল হইতে ফিরিয়াই পীড়িত পিতার সেবায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। রাত্রি দশটার পূর্বে কোনো দিনই বিশ্রামের অবকাশ মিলিত না। তথাপি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে পরিদর্শক এক পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই ক্লাসের টার্মিনাল পরীক্ষাও গৃহীত হইল।

পরিদর্শকের পরীক্ষায় সকল বিষয় মিলাইয়া গান্ধীজি শতকরা বাষট্টিরও অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন। অঙ্কে তিনি বরাবরই কাঁচা। কিন্তু এই পরীক্ষায় অঙ্কে অনেক নম্বর তুলিয়াছিলেন, বোধ হয় জ্যামিতির কল্যাণে। সংস্কৃতেও ভাল নম্বর উঠিয়াছিল।

ক্লাসের টার্মিনাল পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহাতে গড়পড়তা শতকরা ৫৫·৭৫ নম্বর পান।

বার্ষিক পরীক্ষায় আরও উন্নতি দেখা গেল। সকল বিষয়ে

পাস তো করিলেনই, গড় নম্বরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। ক্লাসে ৩৭ জন ছাত্রের মধ্যে ২৬ জন মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইল। গান্ধীজি শতকরা ৫৭·৪ নম্বর পাইয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয়, অঙ্কে তিনি একশর মধ্যে পঁচাশি পাইয়া এক বৃত্তির অধিকারী হইলেন। বৃত্তির পরিমাণ অবশ্য অতি সামান্য, চার টাকা দুই আনা মাত্র।

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠও শেষ হইয়া আসিল। ১৮৮৫-র বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মোহনদাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার চাপ পড়িল সাংঘাতিক। আমরা যে ষষ্ঠ শ্রেণীর কথা বলিতেছি সে ছিল প্রাক্-ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস, আমাদের এখনকার নবম শ্রেণীর অনুরূপ। কিন্তু পাঠক্রম একালকার তুলনায় অনেক কঠিন ছিল। ইংরাজী গদ্যের জন্য পাঠ্য ছিল অ্যাডিসনের 'স্পেক্টেটর' (Addison's *Spectator*) আর পদ্যের জন্য মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' (Milton's *Paradise Lost*)।

একালের ছেলেমেয়েরা কবিতা মুখস্থ করিতে ভয় পায়, সভায় সমিতিতে আবৃত্তির নাম করিয়া বই খুলিয়া কবিতা পাঠ করে, এমন কি গান গাহিতে হইলেও বই না খুলিলে কথা ঘুলাইয়া ফেলে। আর সেকালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্যারাডাইস লস্ট--এর মত বইয়ের দুইশ লাইন কণ্ঠস্থ করিতে হইত। ইহা ছাড়া ইংরাজী ব্যাকরণ প্রভৃতি তো পাঠ্য ছিলই। গুজরাটী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে হইত, সেজন্য স্বতন্ত্র গুজরাটী বই

নির্দিষ্ট ছিল। লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষাও লওয়া হইত এবং সে পরীক্ষাও নিতান্ত সহজ ছিল না।

ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম দিকটা পড়াশুনায় অনেক বাধা পড়িল। কয়েক মাস পূর্বেই পিতার মৃত্যু হইয়াছে (নভেম্বর, ১৮৮৫), সে কারণে সাংসারিক জীবনেও কিছুটা বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক। স্কুলেও কিছু কিছু কামাই ঘটিয়াছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথমার্ধে ১১৭ দিন ক্লাস হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩২ দিন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এখন আর তিনি শিশু নহেন। এখন তিনি আপন কর্তব্য সম্বন্ধে আরও বেশী সচেতন হইয়াছেন, সাংসারিক বিষয়েও নিশ্চয় কিছুটা উৎকণ্ঠার উদ্রেক হইয়াছে, লেখাপড়া বিষয়ে এখন তাঁহার দায়িত্ববোধ প্রবল। তথাপি টার্মিনাল পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। গড়ে শতকরা ৪৭·২ নম্বর পাইয়া পাস করিলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত রকমের ভাল নম্বর পাইলেন অঙ্কে। ক্লাসে যে ছেলেটি প্রায়ই প্রথম হইত, এবং এই টার্মিনাল পরীক্ষাতেও সকল বিষয়ের নম্বর জড়াইয়া প্রথম হইয়াছে, মোহনদাস সেই বীরজি মনোহরদাস গান্ধীকেও অঙ্কে ছাড়াইয়া গেলেন। ইংরাজীতেও লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেল।

প্রথমার্ধে যেটুকু ঘাটতি পড়িয়াছিল দ্বিতীয়ার্ধে তাহা পূরণ করিয়া লইবার জন্য গান্ধীজি নবোদ্যমে আত্মনিয়োগ করিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে ১২৫ দিন ক্লাস হইয়াছিল এই ১২৫ দিনের মধ্যে তিনি একদিনের জন্যও কামাই করেন নাই। বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি গড়ে শতকরা ৪৯·৪ নম্বর পাইয়া সপ্তম শ্রেণীতে উঠিলেন।

ক্লাসের উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল চতুর্থ। বীরজি মনোহরদাস যথারীতি প্রথম হন, তিনি পান শতকরা ৬৩·৮১ নম্বর। তাঁহার শ্রেণী হইতে মাত্র সাত জন ছাত্র সংস্কৃত বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছিল, গান্ধীজি এই সাতজনের একজন। সংস্কৃতে একশর মধ্যে তিনি ৫৬ নম্বর পাইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে কৃষ্ণশংকর পাণ্ড্যর উপদেশ গান্ধীজীবনে ব্যর্থ হয় নাই।

ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি এক বৎসরের জন্য একটি দশ টাকার বৃত্তি লাভ করিলেন। এই বৃত্তির নাম জুনাগড় জেতপুর উচ্চতর বৃত্তি। সুরাট জেলার যে ছাত্র সর্ব বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিবে তাহার জন্যই এই বৃত্তিটি নির্দিষ্ট ছিল। সে বৎসব গান্ধীজি ছাড়া সুরাট জেলার আর কোনো ছাত্র ওই পরীক্ষা দেয় নাই।

৭ | অপরাধ ও অনুশোচনা

কাঠিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই গান্ধীজির বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স তখনও তের পূর্ণ হয় নাই। সে সময় দেশে বাল্যবিবাহের রেওয়াজ ছিল। আজ তিনি বাল্য-বিবাহের ঘোর বিরোধী। কিন্তু বার-তের বছরের কিশোরের পক্ষে ইহার কুফল হৃদয়ংগম করা সম্ভব ছিল না। তাহা ছাড়া পিতৃদেব যাহা করিতেছেন তাহা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইত। সুতরাং বিবাহের মঞ্চে বসিলেন, সপ্তপদী হইল, মিষ্টান্নের এক অংশ স্বামী-স্ত্রী একত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পর দুই অবোধ বালক-বালিকা না জানিয়া সংসারসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

আত্মজীবনী হইতে জানা যায়, মোটের উপর বিবাহিত জীবন তখনকার হিসাবে মন্দ লাগে নাই, এমন কি কিশোরের অন্তরে একটা বিচিত্র আবেশও জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই পর্যন্ত তাঁহার জীবনের রথচক্র সমতল ভূমিতে অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছিল, এইবার সহসা তাহা বাধা পাইল। বড় হইবার পথে বিঘ্ন অনেক। শোনা যায়, বুদ্ধদেব যখন সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া চলিয়াছিলেন তখন 'মার' তাঁহাকে বহু প্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিশোর গান্ধীজিও এইরূপ একটি বন্ধুর কবলে পড়িলেন। বন্ধুর নাম শেখ মেহ্‌তাব।

এই বন্ধুটির সহিত মেলামেশা করা কেহই পছন্দ করেন নাই। গান্ধীজিও ইহার দোষত্রুটির কথা জানিতেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুর চরিত্র হইতে এই কলঙ্কগুলি দূর করিবেন। সমগ্র রাজকোটে তখন সংস্কারের ধুম পড়িয়াছে। এই বন্ধুটি আসিয়া একদিন গান্ধীজিকে খবর দিলেন—ইস্কুলের বহু শিক্ষক গোপনে মাংসভোজন এবং মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরও নাম করিলেন। হাই স্কুলের দুই-চারি জন ছাত্রও ইহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। শুনিয়া গান্ধীজি ব্যথিত হইলেন। আজন্ম বৈষ্ণবের পক্ষে মদ্য মাংস অস্পৃশ্য। কিন্তু বন্ধুর মোহধ্বান্তনাশন উপদেশ অবিলম্বে জন্ম-জন্মান্তরের সকল সংস্কার ঘুচাইয়া দিবার উপক্রম করিল। আমরা পরাধীন কেন? ইংরেজ যে আমাদের পদানত করিয়া রাখিয়াছে তাহার মূল রহস্য কোথায়? সে ওই মাংস খাওয়ার ভিতরেই। নহিলে আমরাও মানুষ, তাহারাও মানুষ! বন্ধুটির শারীরিক শক্তির মাত্রা একটু বেশী। বলিলেন, মাংস খাওয়ার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মাংসভোজীদের ফোড়া হয় না, টিউমার হয় না—দৈবদুর্বিপাকে যদি বা কখনো হয়, চক্ষের নিমেষে সারিয়া যায়। উপসংহারে বলিলেন—অত কথায় কাজ কি, একদিন মাংস খাইয়াই দেখ না।

উপদ্রব একদিনেই সমাপ্ত হয় নাই। বন্ধুটি যে দায়িত্বপূর্ণ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, মোহনদাসকে তাহার অংশিদার করা চাই-ই।

অহর্নিশ যুক্তি তর্কের বন্যা বহিতে লাগিল। এমন সব স্থানে প্রতিপক্ষের তর্কের বাঁধুনি সচরাচর একটু ঢিলা হয় — কারণ নূতন কিছু অর্জন করিবার আশায় মনও অজ্ঞাতসারে তাহাতেই সায় দিতে থাকে। বন্ধুর সুগঠিত দেহ ক্ষীণকায় বালককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শৈশব হইতেই আবার ভূতের ভয়টাও তাঁহার একটু বেশী ছিল। বন্ধুটি বুঝাইয়া দিলেন, ইহাও মাংস না খাওয়ার দোষ।

বড়দাদা ইতিমধ্যে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। দৈহিক শক্তিতে ইনিও তুচ্ছ নন। তিনিও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যথারীতি বুঝাইলেন। স্কুলের ছাত্ররাও গুজরাটী কবি নর্মদের গান লইয়া খুব শোরগোল তুলিয়াছে।

হের হায় ভীমকায় ইংরেজ-বাচ্চা
ক্ষীণকায় ভারতীয় বলে যার বশ্য,
লম্বা পঞ্চ হাত তবিয়ৎ আচ্ছা
মাংসভোজন তার কারণ অবশ্য।

অবিশ্রান্ত তরঙ্গের আঘাতে পাথরও ক্ষয় পায়। বালকের চিত্ত কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারে? বলা বাহুল্য, বন্ধুটিকে আর বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই। অচিরকাল মধ্যে গান্ধীজির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, ইংরেজকে যদি হারাইতে হয় তবে তাহার একমাত্র পন্থা সমগ্র জাতির পক্ষেই মাংসাহার গ্রহণ।

অতঃপর দিন স্থির হইল। প্রথম প্রথম এইসব কাজ অভিভাবকদের আড়ালে একটু বিরলে বসিয়াই করিতে হয়।

তাহারও ত্রুটি হইল না। বন্ধুটি উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বাহির করিলেন। শেষে নির্দিষ্ট দিনে নির্জন নদীতীরে যাইয়া বালক গান্ধী বন্ধুর সহিত পাঁউরুটি-সহযোগে মাংস দিয়া নিয়মভঙ্গ করিলেন।

সংস্কার-মন্ত্রে দীক্ষা হইল, কিন্তু স্বভাবের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এই অনাচারের প্রতিফল তিনি কড়ায় গণ্ডায় ভোগ করিলেন। সে রাত্রে ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিলেন, সেই মৃত ছাগটি পুনর্জন্মলাভ করিয়া তাঁহার পেটের ভিতর অতি করুণস্বরে আর্তনাদ করিতেছে। ধিক্‌কারে অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল যে, মাংসভোজন বিলাসিতার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য হইল শারীরিক শক্তি সঞ্চয় এবং দেশোদ্ধার। ঔষধ কটু হইলেও রোগশান্তির জন্য সেবন করিতেই হইবে। মহৎ কর্তব্য পালনে দুঃখ স্বীকার না করিলে চলে না। মনের মধ্যে তর্কশাস্ত্রের এই সূত্র পাক খাইয়া ঘুরিতে লাগিল।

বন্ধুটিও জানিতেন আছাড় খাইতে খাইতেই মানুষ হাঁটিতে শিখে। ভোজের প্রথম পর্ব সমাধা হইয়াছিল নির্জন নদীতীরে। এবার বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরস করিবার নিমিত্তই এক দরবারী গৃহের সুসজ্জিত টেবিল চেয়ারের মধ্যে তাহার অনুষ্ঠান হইল। ঔষধ ঠিক ধরিল। ফলত পাঁউরুটির উপর আর বিতৃষ্ণা রহিল না, ছাগলের জন্য মমতাও মন্দীভূত হইল। ফলে বৎসরেক কালের মধ্যে পাঁচ-ছয়বার মাংসভোজন হইল।

এদিকে আবার নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত। যেদিন আমিষ খানা খাইতেন, সেদিন বাড়ি ফিরিয়া পুনরায় আহার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। মা খাইতে ডাকিলে, আজ ক্ষুধা নাই, আজ হজম হয় নাই — এই ধরনের নানা প্রবঞ্চনার বাক্য বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতেন বটে, কিন্তু সত্যসন্ধের পক্ষে প্রণালীটা খুব তৃপ্তিদায়ক হইত না। একে তো মিথ্যা, তাহাও আবার মায়ের সম্মুখে। মাংস খাওয়ার আবশ্যকতা আছে, ইহাতে তাঁহার সংশয় ছিল না এবং মাংসাহার প্রচার করিয়া তিনি ভারতবর্ষের সংস্কার করিবেন — মনে মনে এইরূপ সংকল্পও করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতামাতাকে বঞ্চনা করা এবং মিথ্যা কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া ধারণা হইল। সুতরাং পিতামাতা জীবিত থাকিতে আর মাংস খাইবেন না, শেষ পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং বন্ধুকে এই প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া দিলেন।

এই বন্ধুর হাত হইতে বালক গান্ধী সহজে পরিত্রাণ পান নাই। অধঃপাতের আরও কিছু কিছু পথ ইনি নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার অপার করুণার উপরে তিনি চিরদিন নির্ভরশীল, সেই পরমেশ্বরের আশীর্বাদ তাঁহাকে সংসারের সর্বপ্রকার কলুষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে কিংবা পরে আর-একটি ঘটনা ঘটে। একবার শখ হইল বিড়ি খাইবেন। বিড়ির গন্ধে অবশ্য কোনো মোহ ছিল না, কিন্তু পথচারীদের মত মুখে রাশি রাশি ধূম লইয়া কুণ্ডলাকারে উদ্‌গিরণ করার মধ্যে যে একটা বিচিত্র

কৌতুক আছে, তাহারই জন্য বিড়ি খাওয়া আরম্ভ হইল। কিন্তু শখ হইলেই কিছু পূর্ণ করা যায় না ; টাকার প্রয়োজন। তবে সমস্যাটা বেশী দূর গড়াইল না। জনৈক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। খুড়া মহাশয় বিড়ি খাইতেন। তাঁহার ভুক্তাবিশিষ্ট অর্ধদগ্ধ বিড়ির দ্বারাই হাতেখড়ি হইল।

কিন্তু এই অর্ধদগ্ধ বিড়িও সকল সময় জুটিত না। আর তাহাতে যেটুকু ধূম নির্গত হইত, বালকের কৌতূহল নিবারণের পক্ষে তাহা অপর্যাপ্ত নহে। অগত্যা ভৃত্যদের ভাণ্ডার হইতে দুই-চারিটা তাম্রমুদ্রা সরাইয়া কোনো রকমে বিড়ির খরচ চলিতে লাগিল। বিড়ি তো সংগ্রহ হইল কিন্তু রাখা যায় কোথায়? সে-ও মহাচিন্তার কথা! চিন্তায় চিন্তায় কয়েকদিন কাটিল। ইতিমধ্যে দুই বন্ধুতে আবিষ্কার করিলেন, কি একপ্রকার গাছের পাতা বিড়ির অনুকল্প রূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে। বন্ধুদ্বয় অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিলেন এবং সেই দিনই গুরুতর বিড়ি সমস্যার অতি সহজ সমাধান হইয়া গেল। গোপনে ধূমপান চলিতে লাগিল। গুরুজনেরা কেহই টের পাইলেন না। শাস্তি অথবা তিরস্কারের ভয় রহিল না। তবুও শান্তি আসিল না। মোহনদাসের বারংবার এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, বালকদের জীবনে স্বাধীনতার একান্ত অভাব। পদে পদে বাধা আর নিষেধ! শুধু না না না! পরাধীনতার শৃঙ্খল যেন তাহাদের পায়ে পায়ে অক্টোপাসের মত জড়াইয়া আছে।

জীবনে ধিক্‌কার আসিল। পোষ-মানা প্রাণীর মত জীবন রাখিয়া লাভটা কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঠিক করিলেন, এ জীবন আর রাখিবেন না। বিষ খাইয়া এই বিষময় জীবন বিসর্জন করিবেন। কিন্তু বিষ পাওয়া তো সহজ নয়। বিষ কোথায় মিলিবে? কে দিবে? এমন সময় হঠাৎ মনে পড়িল ধুতুরার বীজ তো বিষ, ধুতুরার বীজ খাইলে মানুষ মরে।

অকূল সমুদ্রে কূল মিলিল। যাহা হউক, মরণের জন্য আর বড় একটা ভাবনা রহিল না। তখন তিনি প্রসন্ন মনে বিষ সংগ্রহে মন দিলেন। অল্পকালমধ্যেই ধুতুরার ফল সংগৃহীত হইল। ফল কিছু বেশী করিয়াই তোলা হইয়াছিল সুতরাং বীজের পরিমাণ কম হয় নাই। দুইজন বালকের প্রাণহরণের পক্ষে ধুতুরা বীজ পরিমাণে প্রচুর ছিল না। তাহা লইয়া দুইজনে সন্ধ্যাবেলা কেদারজির মন্দিরে গিয়া প্রদীপে ঘি দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। তারপর মন্দিরের এক নির্জন কোণে বসিয়া আত্ম-হত্যার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তথাপি মরা হইল না। তাহার কারণ এই নহে যে, ধুতুরা বীজ যথেষ্ট প্রাণঘ্ন নয়। কারণ এই যে, মুমূর্ষা আর শেষ পর্যন্ত অবিচল রহিল না। দুই-চারিটি বীজ পেটে পড়িতে না পড়িতেই মনে এমনি ভয় হইল যে দুইজনেই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেখান হইতে গিয়া রামজির মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এবং রামজির মূর্তি দর্শনান্তে জীবিত অবস্থাতেই বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

আত্মহত্যা না ঘটুক কিন্তু এই আত্মজিঘাংসার ফল শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল। যে বিড়ি হইতে এত সমস্যা, প্রতিজ্ঞা করিলেন, জীবনে আর তাহা স্পর্শ করিবেন না।

দুই-তিন বছর পরের — গান্ধীজির বয়স তখন পনের — আর একটি ঘটনা অপেক্ষাকৃত গুরুতর।

মাংসভোজনে দাদার কিছু ঋণ হইয়াছিল। পরিমাণ বেশী নয়, চব্বিশ-পঁচিশ টাকা। কিন্তু এই টাকাও পরিশোধ করা সহজ নয়। অধমর্ণ দাদার হাতে একটি সোনার তাগা ছিল, উভয়ে পরামর্শ করিলেন তাহারই কিয়দংশ কাটিয়া ঋণমুক্ত হইতে হইবে।

তদনুসারে তাগা কাটিয়া ঋণ শোধ করা হইল বটে কিন্তু অনুশোচনার পাষাণভার যেন বুকে চাপিয়া বসিল। গান্ধীজির প্রথম জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই বস্তুটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে — শয়তান যেন লক্ষ বাহুর ইঙ্গিতে তাঁহাকে প্রতি-নিয়তই পাপের পথে আকৃষ্ট করিতেছিল। কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় তিনি প্রতিবারই আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তীব্র অনুশোচনায় প্রতিজ্ঞা করিলেন আর চুরি করিবেন না। চিত্তদাহ যখন ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না, তখন স্থির করিলেন, পিতার নিকট সব কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইবেন। কিন্তু জিভ সরে না! প্রহারের আশঙ্কা খুব কমই ছিল কারণ তিনি কখনো শারীরিক দণ্ড দিতেন না। কিন্তু শুনিয়া পিতা কতটা দুঃখিত হইবেন এই ভাবিয়া গান্ধীজি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এদিকে না

বলিলেও চিত্তশুদ্ধি হয় না। অবশেষে স্থির করিলেন, চিঠি লিখিয়া দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইবেন। শেষ পর্যন্ত চিঠি লেখা হইল। বালক মোহন চিঠি লইয়া ভয়ে সংকোচে পিতার কাছে উপস্থিত হইলেন। চিঠিটা তাঁহার হাতে দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন। পিতা তখন রুগ্‌ণ। চিঠি পড়িবার পর তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অসুস্থতার দরুন তিনি প্রায়ই শুইয়া থাকিতেন, উত্তেজনার বশে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। পুত্র কঠোর ভর্ৎসনাই আশা করিয়াছিলেন, সেখানে পাইলেন অসীম ক্ষমা। সহস্র ধিক্‌কারে লাঞ্ছনায় যাহা কখনো হইতে পারিত না, কয়েক বিন্দু অশ্রুজলে সেই অসাধ্য সাধন হইল। পিতার অশ্রুধারা নির্মল গঙ্গাজলের ন্যায় অনুতপ্ত পুত্রের হৃদয় হইতে সকল মালিন্য নিঃশেষে মার্জনা করিয়া দিল।

ইহারই কিছুদিন পরে একদিন গভীর নিশীথে কাবা গান্ধী পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন।

৮ | ধর্মজিজ্ঞাসা

ছয়-সাত বৎসর বয়স হইতে ষোল বৎসর বয়স অবধি গান্ধীজি ইস্কুলে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মশিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় এমন কোনো শিক্ষা ইস্কুলের পাঠ্যধারার মধ্যে তিনি পান নাই। তথাপি সময়টা একেবারে বিফলে যায় নাই—জন্মগত সংস্কার এবং শৈশবের আবেষ্টনীর প্রভাবে ধর্ম সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা মনে মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বৈষ্ণবকুলে জন্ম; সুতরাং মাঝে মাঝে হাবেলী অর্থাৎ বিষ্ণু-মন্দিরে যাইতে হইত। কিন্তু বিষ্ণুমন্দিরে প্রচলিত কতকগুলি দুর্নীতির কাহিনী শুনিয়া বালকের চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। পিতামাতার সহিত সময়ে সময়ে শিবমন্দির এবং রামমন্দির পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। এদিকে ধাত্রী রম্ভা বাঈয়ের কাছে শুনিলেন—রাম নাম জপ করিলে নাকি বালকের ভীতি-বিধায়ক ভূতপ্রেতগুলি নিজেরাই ভয় পাইয়া সরিয়া পড়ে। বাংলাদেশের শিশুরা আজও 'রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?'—ইত্যাদি ভূতাপসারণ মন্ত্রে ভূত-প্রেতিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। এই গুজরাটী বালকও তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রামনাম জপ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এই নাম জপ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। তথাপি জীবনপ্রভাতে

যে বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা অবিমিশ্র বিফলতায় পর্যবসিত হয় নাই। রামনাম আজও গান্ধীজির নিকট সর্বজয়ী রক্ষাকবচ।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, সুশৃঙ্খল ভাবে ধর্মচর্চা না হইলেও এদিক সেদিক হইতে যেটুকু সংগ্রহ হইয়াছিল, বালকের পক্ষে তাহার পরিমাণ তুচ্ছ নয়।

শৈশবে তাঁহার মন সবচেয়ে অধিক হরণ করিয়াছিল তুলসীদাসের রামায়ণ। কাবা গান্ধী অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন পোরবন্দরে বাস করিয়াছিলেন। রামায়ণের সহিত এখানেই তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। রামজির মন্দিরে প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ হইত। পিতার সহিত পুত্রও শুনিতে যাইতেন। রামচন্দ্রের এক পরম ভক্ত ছিলেন বীলেশ্বরের লাধা মহারাজ। তিনি মন্দিরে রামায়ণ পাঠ করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। একবার ইঁহার কুষ্ঠ হয়। কুষ্ঠরোগীর দুঃখ অনেক। জীবিত হইলেও তাহাকে নানা প্রকারে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া মৃতের মতই সমাজের একান্তে বাস করিতে হয়। চিকিৎসা সম্বন্ধেও আত্মীয়-প্রতিবেশীর দুশ্চিন্তা এবং পরামর্শের অবধি থাকে না। লাধা মহারাজ কিন্তু ইহাতে এতটুকুও বিচলিত হইলেন না। তিনি বীলেশ্বরের মন্দির হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষতে লাগাইয়া রামনাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণ সারিয়া যায়। এই লাধা মহারাজ রামায়ণ পাঠ করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ যেমন মধুর ছিল তেমনি মনোরম ছিল তাঁহার ভাষণের ভঙ্গীটি।

তিনি দোহা এবং চোপাই গাহিতেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ বক্তার মত তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। ভক্তের কণ্ঠে কেবলমাত্র শব্দগুলিই উদ্‌গীত হয় না। বিশ্বাসের গভীরতা এবং শ্রদ্ধার মাধুর্যে মিশিয়া ওই শব্দগুলি এক অভিনব ভাবের ঐশ্বর্যে ভরপুর হইয়া উঠে। গান্ধীজির বয়স তখন বার বৎসর। সেই বাল্যবয়সে শ্রুত রামায়ণ-কাহিনীই তাঁহাকে রামায়ণের প্রতি ভক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। আজও তুলসীদাসের রামায়ণকে তিনি ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

ইহারই কয়েক মাস পরে সকলে রাজকোটে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় হইতেই মোটামুটিভাবে গান্ধীজির ধর্ম-জীবনের সূত্রপাত হয়। পিতা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিলেও ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় সমুদ্রবক্ষের মতই প্রশস্ত ছিল। জৈন ধর্মাচার্যগণও প্রায়ই তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতেন। কাবা গান্ধীও সুযোগ পাইলেই নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদের পরিতোষ বিধান করাইতেন। ইহার উপর আবার মুসলমান এবং পারসী বন্ধুও ছিলেন। ইঁহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতগুলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। এই সব আলোচনার বৈঠকে বালক গান্ধীজিও প্রায়ই পিতার শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। ধর্ম-তত্ত্ব বুঝিবার বয়স তখনও হয় নাই। কিন্তু ধর্মালোচনা মনের উপর কিছু কিছু ক্রিয়া করিতে লাগিল। এই উদার আবেষ্টনীই ধর্মসম্বন্ধে মহাত্মাজির মতবাদকে অনেকটা সার্বজনীন করিয়া তুলিয়াছিল।

কেবল খ্রীস্টধর্মটাই বাদ ছিল। তখন হাই স্কুলের কোণে

দাঁড়াইয়া পাদ্রী সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। খ্রীস্ট-ধর্ম প্রচারের সর্বপ্রধান অংশ ছিল হিন্দুধর্মের কুৎসা-ঘোষণা। অবিশ্রান্তভাবে ইঁহারা হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুদেবতার প্রতি গালি-গালাজ বর্ষণ করিতেন। 'যত মত তত পথ' এই ধরনের একটা মহাজনকথিত বাণীর সহিত অনেকেরই পরিচয় আছে; ইঁহারা উপসংহারে বলিতেন — উহা মিথ্যা। জগতে ধর্ম যদি কিছু থাকে তো ওই খ্রীস্টধর্ম। ইহাই গ্রহণ করিয়া পরলোকের পথ পরিষ্কার কর।

কৌতূহলী হইয়া গান্ধীজিও এক পাদ্রীর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন। কিন্তু শ্রবণের পিতৃভক্তির আদর্শ যাঁহার বুকে দাগ কাটিয়া বসিয়াছে, রামায়ণের ললিত পদধ্বনি যাঁহার কর্ণে মধু-বর্ষণ করিয়াছে—পাদ্রীসাহেবের ধর্মব্যাখ্যা তাঁহার কাছে নিষ্ফল হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে শোনা গেল কে একজন নামজাদা হিন্দু নাকি খ্রীস্টান হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও রটিয়া গেল যে, খ্রীস্টান হইবার সময় তিনি শুধু গোমাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করিয়াই রেহাই পান নাই, তাঁহাকে দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক রীতিমত কোট প্যাণ্টালুনে সজ্জিত হইতে হইয়াছে।

কথাটা গান্ধীজির কানে গেল। শুনিয়া ভাবিলেন — যে ধর্মের জন্য গোমাংস ভক্ষণ করিতে হয়, মদ্যপান না করিলে চলে না, স্বদেশী পোশাক ছাড়িয়া হ্যাট কোট পরিধান করিতে হয়, সে আবার কেমন ধর্ম!

স্বধর্মনিরত এবং পরধর্মে শ্রদ্ধাবান কাবা গান্ধী যে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবে সর্বধর্মের প্রতি একটা সমভাবই জাগিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আস্থা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। একদিন গান্ধীজি পিতার পুঁথির গাদা হইতে মনুসংহিতার একখানি অনুবাদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। জগৎসৃষ্টির ইতিহাস পড়িয়া বালকের মনে নানা সন্দেহের উদয় হইল। মনুসংহিতার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন এই শাস্ত্রগ্রন্থের সৃষ্টিপ্রকরণে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের স্থান নাই। যে বয়সে মানুষ সবকিছুরই হেতু জানিতে চায়, গান্ধীজি সবেমাত্র তাহার কোঠায় পা দিয়াছেন; সুতরাং অযৌক্তিক তত্ত্বকথায়, অলৌকিক রহস্যে তাঁহার মন শান্ত হইল না। ছোট কাকার এক ছেলের প্রতি বিশ্বাস একটু গভীর ছিল। সংশয়ের কথাটা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন, কিন্তু তিনিও ইহার কোনো সুরাহা করিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক বড়দের মতই বলিলেন—এ সব প্রশ্ন ছেলেদের করিতে নাই। বড় হও, তখন নিজেই বুঝিতে পারিবে।

এই মনুসংহিতা সম্বন্ধে আরও বহুবিধ প্রশ্ন বালকের মনকে দোলা দিয়াছিল, কিন্তু বড় হইয়া জানিতে পারিবেন এই ভরসায়, এবং ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায়ান্তর না পাইয়া, অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—বালকের পক্ষে তাহার উপলব্ধি অনায়াসসাধ্য নহে। সুতরাং মনে যে জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইল তাহার পরিতৃপ্তি হইল না। কিন্তু

একটা বড় লাভ হইল। সেই তরুণ বয়সেই গান্ধীজির মনে এই ধারণা সুদৃঢ় হইয়া গেল যে, এই বিশ্বসংসার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর নীতিমাত্রেরই ভিত্তিভূমি হইল সত্য। সুতরাং সত্যকেই তিনি জীবনের মহত্তম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাহারই সন্ধানে সর্বতোরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। আজ পর্যন্ত সে সন্ধানের বিরাম নাই।

এই সময় একটি গুজরাটী নীতিকবিতার প্রতি তাঁহার মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাহার মর্মার্থ এই: শত্রুকেও বন্ধুর মত ভালবাসিয়ো; যে তোমার মন্দ করে তাহারও ভাল করিয়ো।

গান্ধীজির চিত্তে এই কবিতার প্রভাব এতই প্রগাঢ় হইল যে তিনি বাল্যকাল হইতেই অহিংসার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। যে তাঁহার অপকার করে, সর্বপ্রকারে তাহার উপকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে তাঁহাকে আঘাত করে, প্রত্যাঘাতের পরিবর্তে তাহাকে প্রীতিদান করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই কবিতার ভাবানুবাদ এখানে দেওয়া হইল:

অন্নথালি ধর তুমি সম্মুখে তাহার
যে তোমারে তৃপ্ত করে পিপাসার জলে।
যে জন বিনয়বশে নত করে মাথা
লুটাইয়া দাও শির তার পদতলে॥
কানাকড়িটার কাজও করে যদি কেহ
মূল্য তার পরিশোধ করিয়ো মোহরে।

তোমার জীবন যদি কেহ কভু রাখে
তার দুখে তব প্রাণ দিয়ো অকাতরে ॥
এক গুণ লয়ে, যেবা বাক্যে কায়মনে
দশ গুণ দেয় ফিরে, সে জন মহৎ।
কিন্তু সে মহত্তর, যে অনিষ্ট সহি'
উপকার করে ; তারে পূজে ত্রিজগৎ ॥

৯ | ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

সমগ্র ভারতবর্ষে তখন তিনটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল ছিল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাঠিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ও ইহারই অধীন ছিল।

তখনকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল তিনটি, — ভাষা, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান।

ভাষা বিষয়ের জন্য দুইটি পত্র নির্দিষ্ট ছিল। প্রথম পত্রে ইংরাজী এবং দ্বিতীয় পত্রে নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে যে-কোনো একটি,— সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, ফরাসী, আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, মারাঠী, গুজরাটী, কানাড়ী, হিন্দুস্থানী, সিন্ধী।

ইংরাজী বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও একটি ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের বিধান ছিল। পরীক্ষার্থীকে পাঠ্য-বহির্ভূত কোনো গদ্য রচনার কিয়দংশ পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে হইত।

লিখিত অংশে থাকিত ১৫০ নম্বরের প্রশ্ন। ইংরাজীতে সর্বসুদ্ধ এই ২০০ নম্বর। দ্বিতীয় ভাষায় ছিল ১০০ নম্বরের এক পত্র। এই পত্রের সহিতও ইংরাজীর কিছু যোগ ছিল। দ্বিতীয় ভাষা হইতে কিছু কিছু গদ্যাংশ ইংরাজীতে এবং ইংরাজী

রচনাংশও কিছু কিছু দ্বিতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে বলা হইত।

অঙ্কে ছিল দুইটি প্রশ্নপত্র। প্রথম পত্রে পাটীগণিত ও বীজগণিত, দ্বিতীয় পত্রে কেবল জ্যামিতি। প্রথম পত্রের উত্তর-কাল তিন ঘণ্টা, দ্বিতীয়ের দুই ঘণ্টা। দুই পত্রে মিলিয়া মোট নম্বর ১৭৫।

সাধারণ জ্ঞান বিষয়টিও দুই পত্রে বিভক্ত ছিল। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রাথমিক ইতিহাস এবং প্রাথমিক ভূগোল—এই ছিল প্রথম পত্রের পাঠ্য আর দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্য ছিল প্রকৃতি-বিজ্ঞান।

ইংরাজী ভাষাই ছিল পরীক্ষার বাহন। প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তরই ইংরাজীর মাধ্যমে লিখিতে হইত।

বর্তমান কালের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সহিত সেকালকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মানের পার্থক্য কতখানি ছিল তাহা দেখাইবার জন্য বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের প্রশ্ন-পত্রগুলি পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল। এই প্রশ্নপত্র-গুলি উত্তর করিয়াই গান্ধীজি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়া-ছিলেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র বেশী ছিল না। বোম্বাই, পুনা, বেলগাঁও, আমেদাবাদ ও করাচি — এই পাঁচটি কেন্দ্রে সে বৎসরের পরীক্ষা গৃহীত হয়। কাঠিয়াবাড় হইতে আমেদাবাদের দূরত্বই অপেক্ষাকৃত অল্প, তাই কাঠিয়াবাড়ের অধিকাংশ ছাত্রই

আমেদাবাদ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যাইত। বালক মোহনও তাহাদের সহিত গেলেন।

গান্ধীজি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর এক মাস। ইহার পূর্বে গৃহ ছাড়িয়া যখনই কোথাও গিয়াছেন, অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন কেহ না কেহ সঙ্গে গিয়াছেন। পরীক্ষার জন্য রাজকোট হইতে আমেদাবাদ যাত্রার কালে অভিভাবকদের পক্ষ হইতে কেহ সঙ্গে যান নাই। এ-ই হইল তাঁহার একাকী ভ্রমণের প্রথম অভিজ্ঞতা।

পরীক্ষা হইয়া গেল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফলও বাহির হইল। গান্ধীজি উত্তীর্ণ হইলেন। সেবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০৬৭, ইহার মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিল সর্বসুদ্ধ ৭৯৯ জন। গুণানুসারে গান্ধীজির স্থান ছিল ৪০৪তম। কাঠিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয় হইতে সর্বসুদ্ধ ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে গান্ধীজি পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

এই পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কিরূপ নম্বর পাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

ইংরাজী	২০০-র মধ্যে ৮৯ (শতকরা ৪৪·৫)
গুজরাটী	১০০-র মধ্যে ৪৫·৫ (শতকরা ৪৫·৫)
অঙ্ক	১৭৫-এর মধ্যে ৫৯ (শতকরা ৩৪)
সাধারণ জ্ঞান	১৫০-এর মধ্যে ৫৪ (শতকরা ৩৬)

এবার উচ্চশিক্ষার পালা। গান্ধীজি কলেজে ভরতি হইলেন। কলেজ তো কাঠিয়াবাড়ে ছিল না, পড়িতে হইলে যাইতে হয়

বোম্বাই, নয় ভাবনগর। বোম্বাইয়ে পড়া ব্যয়সাপেক্ষ, তাই বোম্বাইয়ের কলেজে প্রবেশ করা হইল না। তিনি ভাবনগরে 'শামল দাস' কলেজে প্রবেশ করিলেন।

জল হইতে ডাঙায় তুলিলে মাছের অবস্থা যেমন হয়, কলেজে পড়িতে গিয়া তাঁহার অবস্থা তেমনি হইল। পড়াশুনা খারাপ হইত তাহা নয়। যাঁহারা পড়াইতেন তাঁহারাও সকলেই বেশ নাম-করা অধ্যাপক ছিলেন। হইলে কি হইবে, কলেজের পড়ায় তাঁহার মন একেবারেই বসিল না। কোনো বক্তৃতাই যেন মাথায় ঢুকিত না। যাহাই হউক, প্রথম কয়েক মাস পড়িবার পর ছুটিতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

১০ | বিলাত যাত্রা

এইবার এক শিক্ষিত, বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতায় তাঁহার জীবন-প্রবাহ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিল। এই ব্রাহ্মণের নাম মাবজি দবে। গান্ধী-পরিবারের ইনি পরম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মাবজি প্রস্তাব করিলেন ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য গান্ধীজিকে বিলাত পাঠানো হউক। মাত্র তিন বছরের ব্যাপার, কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে অন্নবস্ত্রের একটা সংস্থান হইবে। খরচও বেশী নয়, চার-পাঁচ হাজার টাকাতেই চলিয়া যাইবে।

গান্ধীজির তরফ হইতে অবশ্য ইহাতে আপত্তির কোনো কারণ ছিল না — বরং তিনি প্রসন্ন মনেই বিলাত যাইতে চাহিলেন। কিন্তু মাতা বাদ সাধিলেন। সমুদ্রলঙ্ঘন শাস্ত্রনিষিদ্ধ, বিলাতে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছবিচার নাই — অধিকাংশ হিন্দু নরনারীর মত তাঁহারও এ সংস্কার ছিল। সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তরুণ-বয়স্ক পুত্রকে পাঠাইতে মাতার সংশয়াকুল চিত্ত কোনোমতেই সায় দিল না। কিন্তু পুত্রও ছাড়িবার পাত্র নন। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর মাতা বলিলেন — 'একবার বেচরজি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।'

মাবজির মত বেচরজি স্বামীও গান্ধী-পরিবারের পরামর্শদাতা ছিলেন। সব কথা শুনিয়া বলিলেন — বালককে প্রথমে কয়েকটি

প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর উহাকে ছাড়িয়া দিলে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। তাঁহারই নিকট কিশোর বালক প্রতিজ্ঞা করিলেন—বিলাতে তিনি মদমাংস এবং নারীর সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন। মাতার চিত্ত ইহাতে কতখানি শান্ত হইয়াছিল বলিতে পারি না, তবে অতঃপর অনুমতি পাইতে বিলম্ব হয় নাই।

বিলাতে যাইবেন শুনিয়া হাই স্কুলে বিদায়-অভিনন্দন হইল। রাজকোটের কোনো যুবকের বিলাত গমন সেখানকার অধিবাসী-দিগের পক্ষে এক অপরিসীম বিস্ময়ের বস্তু। অভিনন্দনের উত্তরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য তিনিও কিছু লিখিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তের দুর্বলতার জন্য ইহা আর পড়া হইল না। পড়িতে গিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—যাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী আজ লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে অভয় এবং অমৃত বহন করিয়া দিকে দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার প্রথম ভাষণ ভাষা পাইল না!

বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়ে। সম্পূর্ণ নূতন স্থানে নূতন অভিযান—তাই বড় ভাই সঙ্গে আসিলেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে বিলাত যাত্রা তখনকার মত স্থগিত রহিল। তখন বর্ষা-কাল। বন্ধুরা বলিলেন—ভারত মহাসাগরে এই সময় প্রচণ্ড ঝড় হয়, সুতরাং আর কিছুদিন বোম্বাইতে অপেক্ষা করিয়া, সমুদ্রবক্ষ শান্ত হইলে, জাহাজে আরোহণ করা সংগত হইবে। এই সময় একজন আবার একটি জাহাজডুবির খবর আনিয়া দিলেন। বড়

ভাই বুঝিলেন, আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়; কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একজন বন্ধুর নিকট রাখিয়া তিনি রাজকোটে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে বিলাত যাত্রার অবশিষ্ট দিনগুলি গান্ধীজির নিকট দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

নূতন স্থানে নূতন জীবনের স্বপ্ন রচনা করিতে করিতে যাত্রা-দিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একদিন অকস্মাৎ স্বজাতিসভায় তাঁহার ডাক পড়িল।

গান্ধীজি যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল—সমুদ্রলঙ্ঘন শাস্ত্রনিষিদ্ধ; বিশেষত এ যাবৎ কোনো মোঢ় বণিক বিলাত যাত্রা করে নাই; সুতরাং গান্ধীজির বিলাত যাত্রার সংকল্পে স্বজাতির সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু সুবিধা হইল না। মহৎ ব্যক্তিদিগের কুসুমকোমল অন্তঃকরণ স্থলবিশেষে বজ্রকঠিন হইয়া উঠে। জাতি যাইবার ভয়ে তিনি টলিলেন না। জাতির প্রধান ছিলেন গান্ধী-পরিবারেরই এক দূর আত্মীয়। গান্ধীজির এই দুর্জয় সংকল্প দেখিয়া উক্ত জাতিরক্ষক তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ জারি হইয়া গেল, অতঃপর যে এই বিলাতযাত্রী বালককে সাহায্য করিবে অথবা বিদায়ের সময় ইঁহার সঙ্গে যাইবে, তাহাকে পাঁচসিকা জরিমানা দিতে হইবে।

কিন্তু যাঁহার বিরুদ্ধে এত হাঁকডাক তোড়জোড়, এই নির্বাসন-দণ্ড তিনি অসংক্ষুব্ধ চিত্তেই গ্রহণ করিলেন। পূর্বসংকল্প হইতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর গান্ধীজি বোম্বাই বন্দর পরিত্যাগ করিলেন।

জাহাজে আবার এক নূতন সমস্যা আসিয়া জুটিল। সেখানে খাওয়াদাওয়া চলাফেরা কথাবার্তা সবই সাহেবী ধরনের। কাঁটা-চামচের সাহায্যে আহার বালকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। দেশোদ্ধারব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া বন্ধুর উপদেশে কয়েকদিন পাঁউরুটিসহ মাংসাহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ভোজনক্রিয়া হস্তদ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল। কাঁটা-চামচ ধারণ ভারতসংস্কার-ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয় নাই। এখানে ওই দুই যন্ত্র প্রায় অবশ্যব্যবহার্য।

এদিকে গৃহে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, মাংস স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু মাংস ছাড়া কোনো খাদ্য পাওয়া যায় কিনা সংকোচবশত স্টুআর্ডকে তাহা জিজ্ঞাসা করা যাইত না। সঙ্গে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন, অখাদ্য ভোজনের ভয়ে নিজের কামরাতে বসিয়া তাহারই দ্বারা কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

যাত্রীগণের মধ্যে জুনাগড়ের একজন বর্ষীয়ান উকিল ছিলেন ত্র্যম্বক রায় মজুমদার। ইঁহারই সাহচর্যে বালকের জাহাজ-প্রবাসের দিনগুলি অনেকটা সহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

জাহাজে আর একজন ইংরেজের সহিত পরিচয় হয়। ইনি গান্ধীজি অপেক্ষা বয়সে বড়। ইনি স্নেহভরে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কি খান, কোথায়

থাকেন, কোথায় চলিয়াছেন, অত মুখচোরা কেন — ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন। একদিন তিনি গান্ধীজিকে টেবিলে আসিয়া তাঁহার সহিত একত্র খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। গান্ধীজি মাংস খাইবেন না শুনিয়া সাহেব হাসিলেন। বলিলেন — বিস্কে উপসাগর পর্যন্ত চল তো! দেখি সেখানকার ঠাণ্ডায় এ সংকল্প কি রকম টিকে। ইংলণ্ড শীতের দেশ!

গান্ধীজি আপত্তি তুলিলেন — কিন্তু বিলাতে তো শুনিয়াছি অনেকেই মাংস খান না।

সাহেব বলিলেন — বাজে কথা। আমার পরিচিতের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি নিরামিযাশী। মদ খাওয়ার কথা আমি বলি না। ওটা না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু মাংস একেবারেই অপরিহার্য।

গান্ধীজি বিনীতভাবে বলিলেন — কিন্তু আমি মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রয়োজন হইলে না হয় ভারতে ফিরিয়া যাইব, কিন্তু মদ এবং মাংস আমি স্পর্শ করিতে পারিব না।

যথাসময়ে জাহাজ বিস্কে উপসাগরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উভয়ের কোনোটারই প্রয়োজন হইল না। সাহেব বোধ করি মনে মনে বিস্মিত হইলেন।

এমনিভাবে আরও কিছুদিন কাটাইয়া গান্ধীজি সাউদাম্পটনে পৌঁছিলেন। সেদিনটা ছিল শনিবার। জাহাজে গান্ধীজি কালো রঙের পোশাক পরিধান করিতেন — নামিবার সময় ভাবিলেন সাদা পোশাকেই মানাইবে ভাল। ফ্লানেলের একটি স্যুটও

সঙ্গে ছিল। সেইটি পরিয়া নামিয়া আসিলেন। সেপ্টেম্বর মাস তখন সমাপ্তির দিকে — প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। গান্ধীজির হালকা পোশাকে বিড়ম্বনার সীমা রহিল না।

যাহা হউক, চাবি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সকলের দেখা-দেখি গ্রিণ্ডলে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পথে বাহির হইলেন। জাহাজে ত্র্যম্বক রায়ের পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের পরামর্শ অনুযায়ী উভয়ে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রি যত বাড়ে শীতের তীব্রতাও তত বাড়ে। লণ্ডনে নামিয়া বুঝিলেন, সাদা কাপড়ের পোশাক পরিয়া আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। একে তো দারুণ শীত, তাহার উপর সকল লোকের সকৌতুক দৃষ্টি। ইহার উপরে যখন শুনিলেন— আগামীকাল রবিবার, গ্রিণ্ডলে কোম্পানির আপিস বন্ধ, তখন স্বভাবতই অন্তরে বেশ একটু আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

তথাপি প্রতীক্ষা না করিয়া উপায় নাই। ডাক্তার প্রাণ-জীবন মেহতা, দলপতরাম শুক্লা, প্রিন্স রণজিৎ সিংহজি এবং বৃদ্ধ দাদাভাই নওরোজি—এই চারিজনের নামে চারিখানা পরিচয়-পত্র ছিল। সাউদাম্পটনে নামিয়াই গান্ধীজি ডাক্তার মেহতার নিকটে তার করিয়াছিলেন, সন্ধ্যা আটটা নাগাদ তিনি হোটেলে আসিয়া পড়িলেন।

গান্ধীজির এই সুদূর অভিযানে খুশী হইয়া তিনি শুভেচ্ছা জানাইলেন। তাঁহাকে লইয়া অনেক কৌতুক করিলেন, অনেক মিষ্টকথা বলিলেন। গান্ধীজি সম্ভবত ডাক্তার মেহতার টুপিটি

দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আনমনে সেটি হাতে লইয়া তাহার কোমল আবরণের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন। রেশমের সূক্ষ্ম রোমগুলি বিস্রস্ত হইয়া গেল। দেখিয়া ডাক্তার মেহতা একটু রুষ্ট হইলেন শান্তভাবে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন —এ-সব অভ্যাস অসামাজিক। তিনি বিলাতী চালচলন সম্বন্ধে গান্ধীজিকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন,— কাহারো জিনিস স্পর্শ করিতে নাই; উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে লোক উপহাস করিবে; ভারতবর্ষে প্রথম পরিচয়েই আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে অপরিচিত ব্যক্তির নামগোত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসি, বিলাতে ইহা অভদ্রতার নামান্তর; ভারতবর্ষে সাহেবদের সঙ্গে কথা বলিবার সময় অনেকে 'সার্' বলে—বিলাতে অনুরূপ সম্বোধন কেবলমাত্র ভৃত্যেরা তাহাদের মনিবের প্রতি এবং কর্মচারীরা তাহাদের উপরওআলার প্রতি প্রয়োগ করে, সুতরাং সেটাও পরিত্যাজ্য। হোটেলে বাস করা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। ডাক্তার মেহতা বলিলেন—ইহার চেয়ে বরং কোনো গৃহস্থবাড়িতে অবস্থান করা ভাল; তাহাতে খরচও অনেক কম পড়ে।

হোটেলে উভয় বন্ধুই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। ব্যয়-বাহুল্যের কথাটাও তাঁহাদিগকে ভাবাইতেছিল। তখন উভয়ে হোটেল হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এক অভাবনীয় সুযোগ মিলিয়া গেল। জাহাজে জনৈক সিন্ধী সহ-যাত্রীর সহিত মজুমদার মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়; লণ্ডন ইঁহার বহু-পরিচিত। তিনি বলিলেন, বাসা আমিই খুঁজিয়া দিব। ইঁহারই

সহায়তায় সোমবার সকালে দুই বন্ধু এক নূতন বাসায় উঠিয়া আসিলেন। হোটেলের খরচ মিটাইতে যাইয়া তো চক্ষুস্থির! ইতিমধ্যেই তিন পাউণ্ড বিল উঠিয়া গিয়াছে! সঙ্গে যে-পরিমাণ অর্থ আনিয়াছিলেন, বুঝা গেল এই হারে চলিলে তাহা ফুরাইতে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।

নূতন বাসায় উঠিয়া আসিলেন বটে কিন্তু সেখানে আসিয়াও শান্তি পাইলেন না। বহুজনের কোলাহলে মুখরিত হোটেল-গৃহে বাড়ির কথা ভুলিয়া থাকা কঠিন ছিল না, এই নির্জন গৃহে প্রবাস-জীবনের একাকিত্বটা যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া চোখে পড়িল। রাত্রিতে ঘুম আসিত না। মা, দাদা এবং বউঠাকুরানীদের কথা ভাবিয়া বালকের অশ্রুর উৎস আকুল হইয়া উঠিত। সান্ত্বনাই বা পাইবেন কাহার কাছে? সেখানে যে সবাই অপরিচিত। দেশে ফিরিয়া যাওয়াও কোনোমতেই চলিতে পারে না। অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে — দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া যে কার্যে অবতরণ করিয়াছেন, ব্রতাবসানের পূর্বে তাহা হইতে মুক্তির কথা মনেই আনিবেন না। এই তিনটি বছর চোখ বুজিয়া কাটাইতেই হইবে।

১১ | সরলতর জীবনযাত্রা

ডাক্তার মেহতা ভিক্টোরিয়া হোটেল হইতে নূতন ঠিকানা লইয়া সোমবার পুনরায় দেখা করিয়া গেলেন। ঘরের চেহারা দেখিয়া বলিলেন—না, এ চলিতে পারে না। বিলাতে আমরা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার জন্য আসি না — সে উদ্দেশ্য দেশেই সিদ্ধ হইতে পারে! ইংরাজী আদবকায়দাই যদি দুরস্ত না হইল তো বৃথাই বিলাতে আগমন! তোমাকে কোনো গৃহস্থবাড়িতে থাকিতে হইবে।

ডাক্তার মেহতা প্রথমে গান্ধীজিকে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গান্ধীজির সহিত ইনি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। ইঁহার আনুকূল্যের ফলে গান্ধীজির ইংরাজী কথোপকথনের পথ অনেকটা সুগম হইয়া উঠিয়াছিল।

সবই একপ্রকার সুনিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু এখানেও গুরুতর সমস্যা লাগিল আহার লইয়া। গৃহস্বামিনী কি রাঁধিয়া দিবেন, কিছুই ভাবিয়া পান না। ওটমিলের মণ্ড দিয়া কেবল সকালের ভোজনটা মোটামুটি মন্দ হইত না, অন্তত পেট কিছুটা ভরিত। বন্ধুটি তো ক্রমাগত মাংস খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। গান্ধীজির এক উত্তর — 'না'।

কোনো যুক্তি যখন খাটিল না, তখন মনীষী লোকের কথায় কাজ হইবে ভাবিয়া একদিন তিনি বেন্থামের 'থিওরি অফ ইউটিলিটি'

বইখানি লইয়া গান্ধীজির নিকটে পড়িতে বসিলেন। উপযোগিতা-বাদের বিষয়টি তাঁহাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইলেন। সদ্য ইস্কুল হইতে আগত বালকের পক্ষে বইটির ভাষা অত্যন্ত দুরূহ, সুতরাং ফল কিছুই হইল না। বন্ধু তখন ধীরে ধীরে বুঝাইতে লাগিলেন। যুক্তিতর্কে গান্ধীজি ইঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেও, কিছুতেই মাংস খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া অনুরোধের আশ্রয় লইলেন। ইঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রতি গান্ধীজির অসীম শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সত্যের অপলাপই বা কেমন করিয়া করিবেন? বন্ধুকে বলিলেন — আপনার এই অনুরোধের মূলে যে শুদ্ধমাত্র কল্যাণকামনা রহিয়াছে সে আমি বুঝি; কিন্তু মায়ের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ করাই কি পুত্রের পক্ষে সংগত হইবে? বন্ধু বালকের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন — বেশ, এই বিষয়ে আর কিছুই বলিব না।

বলা বাহুল্য, অতঃপর যুক্তিতর্কের আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বন্ধুটির উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না। বিদেশে-বিভুঁয়ে অপরিণত-বয়স্ক যুবক খেয়ালের বশে স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।

স্নেহবশত তিনি সর্বদাই আশঙ্কা করিতেন, মাংস না খাইলে শক্তির অপচয় হইবেই, কাজেই গান্ধীজি যে উদ্দেশ্যে বিলাতে আসিয়াছেন তাহা কিছুমাত্র সিদ্ধ হইবে না। এমন শুচিবায়ু-গ্রস্তের মত সমাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে

যেমনটি আসিয়াছেন, তিন বছর পরেও ঠিক তেমনটিই গৃহে ফিরিয়া যাইবেন।

কথাটা অবহেলা করিবার নয়। গান্ধীজি মনে মনে ভাবিলেন, এইবার পুরাদস্তুর ইংরেজ সাজিতে হইবে।

পোশাকের উপরেই সর্বপ্রথম নজর পড়িল। বোম্বাই-ফ্যাশনের যে পোশাকগুলি সঙ্গে ছিল, সেগুলি বোম্বাইয়ে চলিতে পারে, বিলাতে অচল। বিলাতের উপযোগী একটি স্যুট তৈয়ারি করানো হইল। কান টানিলেই দেহের অপরাপর অঙ্গ যেমন অনাহূত আসিয়া পড়ে, তেমনি স্যুটের সঙ্গে সঙ্গে সিল্কের টুপি, দামী নেকটাই এবং ঘড়ির জন্য সোনার ডবল চেন একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িল। দাদাকে চিঠি লিখিয়া বাড়ি হইতে ঘড়ির চেন আনাইয়া লইলেন। মাথা নিজের হইলে কি হইবে — চুল মোটেই সংযত নহে। এই অবাধ্য কেশগুলিকে বশে আনিতে যাইয়া প্রত্যহ আয়নার সম্মুখে বুরুশ সহযোগে দশমিনিটব্যাপী রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পোশাক সভ্যতার অঙ্গ মাত্র, সম্পূর্ণ মূর্তি নয়। তাই সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার দিকে দৃষ্টি পড়িল। গান্ধীজি তিন পাউণ্ড জমা দিয়া নাচের ক্লাসে ভরতি হইলেন। তিন সপ্তাহে ছয়টি ক্লাস হইল। কিন্তু মুশকিল হইল, পিয়ানোর তালে তালে পা চলে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন।

নাচের পরই বেহালা শিখিবার দিকে মন দিলেন এবং তাহাতে পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশী ব্যয় হইল।

ইহার পর বক্তৃতা শিখিবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক খুঁজিয়া লইলেন এবং তাঁহারই উপদেশে বেল্ সাহেবের 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিস্ট' এক কপি কিনিয়া পুরাদমে বক্তৃতা শিক্ষা শুরু করিয়া দিলেন।

কিন্তু এই বেল্ সাহেবই তাঁহাকে প্রথম সাবধানবাণী শুনাইলেন। বেল্ সাহেবের গ্রন্থ পড়িতে পড়িতেই গান্ধীজি যেন প্রসুপ্তির ঘোর কাটাইয়া সহসা জাগিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, বিলাতে আসিয়াছেন তুদিনের জন্য, তাহা তো পড়াশুনার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এদেশবাসীদিগের ধারানুযায়ী নাচ-গান শিখিয়া সভ্য সাজিয়া লাভ কি? তাহা ছাড়া, নৃত্যকুশলী হইলেই মানুষ সভ্য হয় না। বেহালা যদি শিখিতে হয় সে তো দেশেই শিখিতে পাইবেন। বিত্থার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছেন, এই সব চিত্তবিভ্রান্তকারী আয়োজনে মত্ত থাকিলে শিক্ষার পথ অযথা বিঘ্নবহুল হইবে। স্থির করিলেন — নিষ্কলুষ চরিত্র যদি সভ্য বলিয়া পরিচিত করে, উত্তম। নতুবা তাহার প্রয়োজন নাই। কৃত্রিম উপায়ে সভ্য সাজিবার অভিলাষ জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

এই মর্মেই তিনি বক্তৃতাশিক্ষক এবং নৃত্যশিক্ষকের নিকট পত্র লিখিয়া দিলেন। উভয়কেই লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নৃত্য এবং বক্তৃতা শিখিবার আর তাঁহার ইচ্ছা নাই।

বেহালা-শিক্ষয়িত্রীর নিকট স্বয়ং যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহার সহিত আন্তরিক সৌহার্দ্য ছিল, সুতরাং তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। শিক্ষয়িত্রী গান্ধীজির কথা শুনিয়া প্রসন্নমনে

তাঁহার শুভেচ্ছা জানাইলেন। ঠিক হইল, শিক্ষানবীশির জন্য যে বেহালাটা ক্রয় করা হইয়াছিল, শিক্ষয়িত্রী তাহা কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দিবেন।

ছাত্রজীবনের পবিত্র আদর্শ সমাজজীবনের গ্লানিকর অনুকরণ হইতে গান্ধীজিকে অব্যাহতি দিল। তিনি মনে-প্রাণে শিক্ষার্থী হইয়া উঠিলেন। বিলাসিতা এবং অমিতব্যয়িতা ছাত্রজীবনের দুরতিক্রম অভিশাপ। এই দুটি অভ্যাস পরিহার করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

তখন গান্ধীজির মাসিক ব্যয় ছিল পনের পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দুই-শ পঁচিশ টাকা। গাড়িভাড়ার খরচটা খুব বেশী। ইহার উপর যে পরিবারে বাস করিতেন, সৌজন্যের খাতিরে মাঝে মাঝে তাঁহাদের হোটেলে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। এ খরচটাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। এই উভয়বিধ ব্যয়ের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল কর্মস্থলের নিকটবর্তী কোনো বাসায় স্বাধীনভাবে বসবাস করা। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই উপায়ই অবলম্বন করিলেন এবং দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া পরিবারের আশ্রয় ছাড়িয়া দিলেন।

এমনি ভাবে খরচের পরিমাণ অর্ধেক কমিল। এইবার সময়ের সদ্ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য তাড়া ছিল না— ইহাতে খুব বেশী সময় লাগে না। ইংরাজী জ্ঞানটা খুব পরিপক্ক নয় ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতেন— তাহারই উন্নতিকল্পে প্রাণপণ করিয়া লাগিয়া গেলেন।

অক্সফোর্ড এবং কেম্‌ব্রিজের প্রতিই প্রথম দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সেখানে পড়া সম্ভব নয়। কারণ সেখানে পড়ার খরচ খুব বেশী। অধিকন্তু সময়ও লাগিবে প্রচুর। অবশেষে এক বন্ধু বলিলেন, যদি কোনো কঠিন পরীক্ষায় পাস করিতে চাও তো লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পড়। খরচ নাই বলিলেই হয়। অথচ ইহাতে সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট বাড়িবে।

কিন্তু পরীক্ষার পাঠ্য দেখিয়া গান্ধীজি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ল্যাটিন এবং আর-একটি ভাষা অবশ্য শিখিতে হইবে। ল্যাটিন তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু বন্ধুটি বলিলেন — ল্যাটিন না জানিলে উকিলের চলে না। রোমীয় আইন পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র শুধু ল্যাটিন ভাষাতেই থাকে। তাহা ছাড়া ল্যাটিন জানিলে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করাও সহজ হইবে।

বন্ধুর উপদেশে ফল ফলিল। গান্ধীজি স্থির করিলেন যত কঠিনই হউক, ল্যাটিন অবশ্য শিখিবেন। ফরাসী শিক্ষা ইতি-মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাই দ্বিতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করিলেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা হইত। পরবর্তী পরীক্ষা হইতে তখন পাঁচ মাস বাকী। এই পাঁচ মাস ধরিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া তিনি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করিয়াও এবার তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। ল্যাটিনে ফেল করিলেন। গান্ধীজি দুঃখিত হইলেন সত্য, কিন্তু হাল ছাড়িলেন না। এই অকৃত-কার্যতাকেই ভিত্তি করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বুক বাঁধিয়া পুনরায়

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রথমবারে বিজ্ঞানের পাঠ্য ছিল রসায়নশাস্ত্র। কিন্তু হাতে-কলমে পরীক্ষার সুযোগ ছিল না বলিয়া তাহা একান্তই নীরস বোধ হইয়াছিল। এবার রসায়নের বদলে লইলেন আলোক- এবং তাপ-বিদ্যা। ছয় মাস অন্তে পরীক্ষা হইল — এবার তিনি উত্তীর্ণ হইলেন।

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজির জীবন-যাত্রা ক্রমশ সরল হইতে সরলতর হইয়া উঠিল। ভ্রাতার অসচ্ছল অবস্থার কথা এখন মনকে পীড়িত করিতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন নিজের চালচলনের মধ্যে বিলাসিতার লেশমাত্র সংস্পর্শ রাখাও অপরাধ হইবে। বিলাতে যাহারা যায়, সকলেই রাজপুত্র নয়। বহু দরিদ্র ছাত্রও যায়। এমন ছাত্রও দেখিলেন, যাহারা লণ্ডনের দরিদ্র পল্লীতে সপ্তাহে দুই শিলিং ভাড়া দিয়া থাকিত আর দুই পেনি মূল্যের কোকো এবং রুটি খাইয়া দিন কাটাইত।

কৃচ্ছ্রসাধনে এবং শ্রমসহিষ্ণুতায় ইহাদের সহিত প্রতি-যোগিতা করিবার মত শক্তি অবশ্য তাঁহার ছিল না। তথাপি ভাবিলেন দুইটি ঘরের মধ্যে একটি ছাড়িয়া দিতে হানি নাই। সকালের রন্ধনের ভার স্বহস্তে লইলে পছন্দসই খাদ্যও তৈয়ারি হয়, খরচের পরিমাণও হ্রাস পায়। তাহাই হইল। দুইখানি ঘর ছাড়িয়া সপ্তাহে আট শিলিং ভাড়ায় একখানি ঘর লইলেন। আর একটি স্টোভ কিনিয়া স্বপাকে ব্রতী হইলেন। ইহাতে দৈনিক ব্যয় যেমন অনেক কমিল তেমনি অবসরও মিলিল

প্রচুর। ওটমিলের পরিজ এবং কোকো তৈয়ার করিতে কুড়ি মিনিটের অধিক সময় লাগিত না।

এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সত্ত্বেও গান্ধীজির অন্তর্জীবন নীরস হইয়া পড়ে নাই। মনের আনুকূল্য থাকিলে কোনো কার্যই কঠিন হয় না। বরং এই অভিনব প্রণালীতে তাঁহার অন্তর্জীবন এবং বহির্জীবনের মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য স্থাপিত হইল। এই পরীক্ষার ফলে তাঁহার জীবন মিথ্যার নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইল। অসত্যের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে সত্যের শুভ্র জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অন্তরে তিনি পরমানন্দ অনুভব করিলেন।

১২ | নিরামিষ আহার

ব্যয়সংক্ষেপের সহিত আহার্য সম্বন্ধেও বিবিধ গবেষণা চলিতে-ছিল। নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তকও ইতি-মধ্যে পড়িয়া ফেলিলেন। এই সব পুস্তকে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দিক হইতে নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নৈতিক দিক হইতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, মানুষ যে সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য পাইয়াছে, সে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য নয়, বিপদ আপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য। মানুষের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ, পশুপক্ষীর সহিতও তাহার সেই সম্বন্ধ রক্ষা করা কর্তব্য, বিধাতার ইহাই অভিপ্রেত। যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা মানুষের শরীরের গঠনপ্রণালী বিচার করিয়া বলেন, মানুষের রন্ধন করিবার প্রয়োজনই নাই — বনের পক্ব ফলই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য। যাঁহারা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহারা বলেন, নিরামিষ ভোজনে ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। অথচ শরীরপোষণের দিক হইতে নিরামিষ খাদ্যের উপযোগিতা আমিষের অপেক্ষা অল্প নহে।

নিরামিষ ভোজনালয়ে কয়েকজন নিরামিষাশীর সহিত এই সূত্রে তাঁহার পরিচয়ও হইয়া গেল। ইহাদের একটি সমিতি

ছিল লণ্ডনে — এই সমিতি প্রতি সপ্তাহে একটি পত্রিকা বাহির করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের মত প্রচার করিতেন। গান্ধীজি এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া সভার সভ্য মনোনীত হইলেন, অল্প কিছু দিন পরেই কার্যনির্বাহক-কমিটিতে তাঁহার ডাক পড়িল।

নিরামিষ আহার গান্ধীজি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা ছিল মাংস খাইবেন না। ডিম মাংস নয় বলিয়া ডিম পরিত্যাগ করেন নাই। এইবার প্রতিজ্ঞার সত্য রূপটি প্রকাশিত হইল। তিনি বুঝিলেন — মা যখন প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন তখন ডিমের কথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু ধরিয়া লইতে হইবে ডিমটা খাওয়াও তাঁহার অভিপ্রেত নয়। ইহারই কিছু পরে তাঁহার খাওয়ার টেবিল হইতে ডিমও অন্তর্হিত হইল। ব্রত গ্রহণ করিবার পর হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছিলেন স্বাদের স্থান জিহ্বা নহে — মন। এই নূতন উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে যে মিষ্টান্ন আনাইতেন তাহাও বন্ধ করিলেন। মন অন্য দিকে ফিরিল এবং মসলার আস্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা কমিয়া গেল। ফলে যে তরকারি 'রিচমণ্ড' মসলা ব্যতীত বিস্বাদ লাগিত এখন তাহা সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল।

নূতন কোনো ধর্ম গ্রহণের সময় গ্রহীতার মনে সেই ধর্ম প্রচারের একটা আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিয়া গান্ধীজিও ইতিপূর্বে মাংসাহারেরই পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে নূতন ধর্মের প্রথম উত্তেজনা তাঁহাকেও বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি এখন বেজওয়াটারের অধিবাসী। স্থির

করিলেন এইখানে নিরামিষভোজীদের একটা ক্লাব খুলিয়া প্রচার-কার্য চালাইতে হইবে। ডাক্তার ওল্ডফিল্ড হইলেন সভাপতি। সার এডুইন আর্নল্ড সহকারী সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং গান্ধীজি স্বয়ং সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করিয়া পুরাদমে কাজ শুরু করিয়া দিলেন। সভাটির কিন্তু অপমৃত্যু হইয়াছিল। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গান্ধীজি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া নূতন নূতন বাসায় আশ্রয় লইতেন। এক পল্লীতে দীর্ঘকাল থাকা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। বেজওয়াটার হইতে তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবটিও কৈবল্য লাভ করিল।

ক্লাবের জীবদ্দশায় মধ্যে মধ্যে অধিবেশন হইত। সভ্যগণ শাকান্ন ভোজনের সমর্থনে কেহ বা স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, কেহ বা বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু গান্ধীজি এই সময়টা সম্পূর্ণ নির্বাক্-ভাবে কাটাইয়া দিতেন। কিছু বলিতে গেলেই তাঁহার হাত পা কাঁপিত। কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিত। ভাবীকালে যাঁহার কণ্ঠে স্বয়ং সরস্বতী তাঁহার শ্বেত পদ্মের আসনটি স্থায়ীভাবে পাতিয়া বসিবেন সেই তিনি সেদিন ছিলেন কোথায়? বোধ করি ভক্তকে শ্রেষ্ঠ বর দিবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুর পরীক্ষায় রত ছিলেন। ডাক্তার ওল্ডফিল্ড বলিতেন — এখনই সভা ভাঙিলে আমার সহিত বেশ আলাপ করিবে, অথচ সভাস্থলে এমন বোবার মত মুখ বুজিয়া থাক কেন!

পাঁচজনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সাহস তাঁহার একেবারেই ছিল না। এই দুর্বলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকিয়াও ইহাকে অনায়াসে দূর করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। বিলাতে যতদিন ছিলেন—একবার নয় দুইবার নয়, অনেকবারই চেষ্টা করিয়াছেন এবং বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রতিবারই লজ্জা পাইয়াছেন। তবু নিরস্ত হন নাই।

সেখান হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিবার শেষ চেষ্টা করিলেন। বিলাত ত্যাগের পূর্বে শাকান্নভোজী বন্ধুদের লইয়া এক প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান করিলেন। সভায় গীতবাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠানও ভালই হইয়াছিল। বন্ধুরা ভোজ এবং ভোজের আনুষঙ্গিক আয়োজন পরম পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময় নিমন্ত্রণকর্তার বক্তৃতার সময় উপস্থিত হইল। সে অভিভাষণের জন্য তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। মনে মনে সাজাইয়া গুছাইয়া তাহার একটা খসড়াও তৈয়ারি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিতে না করিতেই মন্ত্রৌষধি-অভিভূত সর্পের ন্যায় কেমন অক্ষম হইয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আত্মজীবনীতে অ্যাডিসনের জীবনবৃত্তান্ত হইতে সেই সুন্দর কাহিনীটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। লাজুক অ্যাডিসন একবার এক সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া বলিলেন—আমি ধারণা করি — আমি ধারণা করি — আমি ধারণা করি (I conceive — I conceive — I conceive), ইহার পরেই সহসা রুদ্ধবাক্ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, ভদ্রলোক তিন-তিনবার গর্ভধারণ করিলেন কিন্তু কিছুই প্রসব করিলেন না!

আজ গান্ধীজির দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের অন্ত পাই না। যিনি একদিন হাজার চেষ্টা করিয়াও একটি কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, আজ কথার সংযম রক্ষা করার জন্য তাঁহাকে সপ্তাহে একদিন করিয়া মৌন দিবস পালন করিতে হয়।

১৩ ধর্মচিন্তা

বালক বয়সেই ধর্ম সম্বন্ধে গান্ধীজির একটা মোটামুটি ধারণা হইয়াছিল। প্রবাসজীবনে তাহাই কিছু পরিবর্তিত কিছু রূপান্তরিত কিছু পরিবর্ধিত হইয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আহারের সহিত মনের সম্বন্ধটা নিবিড়। মসলাবর্জিত নিরামিষ আহারের সহিত মনও ক্রমেই সত্ত্বভাবাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে তুইজন থিয়সফিস্টের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। ইঁহারা তুই ভাই, তুইজনই অবিবাহিত। এই থিয়সফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গান্ধীজির ধর্মসম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। ভারতবাসী দেখিয়া তাঁহারা গান্ধীজির নিকটে গীতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। গান্ধীজি তখনও পর্যন্ত গীতা পড়েন নাই, এমন কি তাহার গুজরাটী অনুবাদও না। তাহাতে বিশেষ লজ্জা পাওয়ার কারণ আছে কিনা জানি না। উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে আমরা কয়জনেই বা গীতা পাঠ করি এবং তাহা না করার জন্য লজ্জা বোধ করি ? কিন্তু গান্ধীজি নিরতিশয় লজ্জা পাইলেন।

তিনি থিয়সফিস্ট ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন। পণ্ডিত কৃষ্ণশংকরের আগ্রহে তিনি যেটুকু সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই উপদেশের ফলে সংস্কৃত ভাষায়

তাঁহার যে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল জীবনের কার্যক্ষেত্রে এই তাহার প্রথম প্রয়োগ আরম্ভ হইল।

তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আজ তিনি যে গ্রন্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, তিন বন্ধুতে মিলিয়া অনুবাদ মিলাইয়া সেই ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। গীতার ইংরাজী অনুবাদ যতগুলি ছিল সবগুলিই তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। ইহার মধ্যে সার্ এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদটিই তাঁহাকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল।

থিয়সফিস্ট বন্ধুদের উপদেশে তিনি উক্ত গ্রন্থকারের বুদ্ধচরিত-বিষয়ক 'দি লাইট অফ এশিয়া' নামক গ্রন্থখানিও পড়িয়া ফেলিলেন। শৈশবকাল হইতেই যে সুর তাঁহার অন্তরে মৃদু গুঞ্জরন তুলিয়াছিল, এই দুইটি গ্রন্থের মধ্যে তাহা বাণী খুঁজিয়া পাইল। এই অনাসক্ত সন্ন্যাসীর মনে গীতার এই দুইটি শ্লোক বারংবার আবর্তিত হইয়া ফিরিতে লাগিল :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

যে ব্যক্তি যে বিষয়ের চিন্তা করে সেই বিষয়ে তাহার আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, আর কামনা হইতেই ক্রোধের জন্ম। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে। যাহার বুদ্ধিনাশ হয় তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তিনি বুঝিলেন প্রকৃত শান্তিলাভ হয় ত্যাগে, ভোগে নয়। জীবনের যাত্রাপথ তখনই প্রায় স্থির হইয়া গেল।

গান্ধীজি থিয়সফিস্ট বন্ধুদের সহিত একবার ব্লাভাটস্কি লজে গিয়াছিলেন। এখানেই ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এবং অ্যানি বেসাণ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বেসাণ্ট তখন সবেমাত্র থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির 'কী টু থিয়সফি' বইখানি গান্ধীজি মনোনিবেশপূর্বক পড়িয়াছিলেন। জনৈক খ্রীস্টান বন্ধুর অনুরোধে তিনি বাইবেলও এই সময় পড়েন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশ তাঁহার ভাল লাগে নাই, কিন্তু নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। যীশু খ্রীস্টের 'সার্মন্ অন্ দি মাউণ্ট' পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, সকল মহাপুরুষেরই এক উপদেশ — মুক্তির পথ ত্যাগে, ভোগে নহে। অজ্ঞান-মোহতিমির অপসারিত করিয়া জ্ঞানের অনির্বাণ আলোক লাভ করিতে হইলে ত্যাগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আস্তিক্যবাদ মানিতে হইলে নাস্তিকদের মতটাও জানা আবশ্যক। সেজন্য তিনি ব্রাড্‌ল লিখিত নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে রচিত কিছু কিছু বই পড়িলেন। ব্রাড্‌ল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। নাস্তিকতার জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও তাঁহার নাম অপরিচিত ছিল না। এই নাস্তিক পণ্ডিতের কয়েকটি পুস্তক তাঁহার পড়া হইল। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল ফলে নাই।

নাস্তিকতার সাহারা মরুভূমি তিনি পূর্বেই পার হইয়া গিয়াছিলেন।

অ্যানি বেসান্টের কথা তখন গৃহে গৃহে আলোচনার বিষয়। তিনি প্রথমে নাস্তিক ছিলেন পরে আস্তিক হন। ইহাতে আস্তিক্যবাদের প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধিও পাইল।

এই সময় নাস্তিকতার প্রতি তাঁহার মনোভাব এক বিশেষ ঘটনায় অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। সেই ঘটনাটির কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নাস্তিক্যবাদের সমর্থক ব্রাড্‌ল সাহেবের এই সময় মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংকার হয় ওকিং-এ। লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে প্রায় সকলেই মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, গান্ধীজিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। ওদেশীয় ধর্মযাজকও কয়েকজন সেখানে গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা সংকারস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই যে মৃতের মতের সমর্থক ছিলেন তাহা নহে, বরং অধিকাংশই নাস্তিক্যবাদের বিরোধী ছিলেন।

সংকার সম্পন্ন হইলে তাঁহারা সকলে একটি স্টেশনে আসিয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দলের মধ্যে যণ্ডা গোছের চেহারাওয়ালা একটি লোক ছিল। লোকটি নাস্তিক্যবাদে আস্থাবান। তাহাতে কিছু আসে যায় না। সকল মানুষেরই যে ধর্মবিশ্বাস সমান হইবে তাহার কোনো মানে নাই। কিন্তু এই লোকটি অত্যন্ত গোঁড়া, যাহাকে বলে ধর্মান্ধ। সে যে শুধু নিজের ধর্মবিশ্বাসে আস্থাবান তাহা নহে, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ।

এই লোকটির আত্মাভিমান ও ঔদ্ধত্য দেখিয়া গান্ধীজি অত্যন্ত পীড়িত হইলেন ; লোকটি ধর্মযাজকদের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস লইয়া রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল।

একজন ধর্মযাজককে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'কি মহাশয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন ?'

ধর্মযাজকটি ভাল মানুষ। তিনি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, 'হাঁ আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আছেন।'

লোকটি হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাবটা এই, পৃথিবীতে যাহা কিছু জানিবার আছে সব সে জানিয়া ফেলিয়াছে। আর যত লোক সকলে মূর্খ, অজ্ঞান. কৃপার পাত্র। ওই ধর্মযাজককেও সে নির্বোধ বলিয়াই মনে করিল এবং তাঁহাকে জ্ঞানদান করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, 'আচ্ছা পৃথিবীর পরিধি কত ? আটাশ হাজার মাইল— এ কথা আপনি মানেন তো ?'

ভদ্রলোক মানেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'বেশ, তাহা হইলে বলুন ঈশ্বরের শরীরটা কত বড় ? আর তিনি থাকেন কোন্ জায়গায় ?'

ধর্মযাজক সবিনয়ে বলিলেন, 'আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যেই তাঁহার বাস।'

ষণ্ডা লোকটি অবজ্ঞার সহিত বলিল, 'আমাকে কি কচি খোকা পাইয়াছেন নাকি যে, যাহা খুশি বলিয়া ভুলাইবেন !'

এই বলিয়া ওই বীরপুরুষ বিজয়ী যোদ্ধার মত বুক ফুলাইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। সেই অহংকৃত দৃষ্টির অর্থ,—

৬

তোমরা সকলে চাহিয়া দেখ আমি বুদ্ধির জোরে এই ধর্মযাজককে হারাইয়া দিয়াছি। আমি প্রমাণ করিয়া দিয়াছি ভগবান বলিয়া কিছুই নাই।

এই নাস্তিকের ব্যবহার নাস্তিক্যবাদের প্রতি গান্ধীজির মনকে আরও বিরোধী করিয়া তুলিল।

ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না —এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পাঠ্য বিষয় এমন কিছু গুরুতর নয়। তাই পরিহাস করিয়া ব্যারিস্টারদিগকে 'ডিনার (ভোজ) ব্যারিস্টার' বলা হয়। গান্ধীজির যুগে দুই বিষয়ে পরীক্ষা হইত, রোমীয় আইন এবং ইংলণ্ডীয় আইন। পড়িবার জন্য অবশ্য বিভিন্ন পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু নোটের কল্যাণে ছাত্রদিগকে দুঃখ পাইতে হইত না। কিন্তু গান্ধীজি এই সহজ পথও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মূল গ্রন্থগুলি পড়াও দরকার। না পড়া তিনি প্রবঞ্চনা বলিয়া মনে করিলেন। সুতরাং তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া আইনের মূল গ্রন্থগুলি কিনিলেন এবং মনোযোগ সহকারে সেগুলি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য পড়িবার সময় সাধারণ জ্ঞান অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশে সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস ছিল না। — সে যুগে অত অল্পবয়সে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এখানে বিবিধ সংবাদপত্র পাঠ তাঁহার নিত্যক্রিয়ার তালিকাভুক্ত হইয়া যায়।

নিজের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ — এই সত্যটি তিনি ধীরে

ধীরে উপলব্ধি করিলেন। ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরানুরাগ, জীবে দয়া—তাঁহার মজ্জাগত হইয়া গেল।

যাহাই হউক, তিন বৎসর বিলাতে অবস্থান এবং অধ্যয়নের পর ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুন ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১২ই জুন তারিখে গান্ধীজি স্বদেশযাত্রা করিলেন।

১৪ | পুতলীবাঈয়ের মৃত্যু

জুন-জুলাই মাসে ভারত মহাসাগরে প্রায়ই ঝড় তুফান দেখা দেয়। এই সংক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ বাহিয়া গান্ধীজি দেশে ফিরিলেন। প্রবাস-জীবনের শেষে মায়ের চবণে আসিয়া প্রণাম করিবেন — জননী তাঁহার স্নেহসজল দুই চক্ষুব দৃষ্টিতে অভিষিক্ত কবিয়া পুত্রকে বুকে টানিয়া লইবেন — তাঁহার সকল জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হইবে — এমনি কত শত কল্পনা করিয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিয়া তাঁহার কল্পনার বাষ্পটুকুও যেন খর-রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া গেল। পুতলীবাঈ ইতিমধ্যে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বড় ভাই দুঃসংবাদটা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। দূরদেশে তাঁহার পড়াশুনার বিঘ্ন হইবে বলিয়া জানান নাই। মাতার মৃত্যু-সংবাদে গান্ধীজি অত্যন্ত কাতর হইলেন। পিতার মৃত্যু অপেক্ষাও এ দুঃখ তাঁহাকে অধিক বাজিয়াছিল।

ডাক্তার মেহতার সহিত বিলাতেই গান্ধীজির পরিচয় হয়। বিলাতপ্রত্যাগত বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনিও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিনের মত গান্ধীজি তাঁহার বাড়িতেই আশ্রয় লইলেন। এখানে মেহতার মধ্যস্থতায় যাঁহাদের সহিত তিনি পরিচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে কবি রাজচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার মেহতার বড় ভাই রেবাশংকরের ইনি ছিলেন জামাতা। তিনি হাজার-হাজার টাকার ব্যবসা করিতেন। হীরা মোতি পরখ করিতেন। ব্যবসায়-সম্পর্কীয় জটিল প্রশ্নের সমাধা করিতেন। রেবাশংকরের কারবারের ইনিই হর্তাকর্তা।

একই সময়ে একশত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল 'শতাবধানী'। গান্ধীজির কৌতূহল হইল — এই অদ্ভুত শক্তিটি যাচাই করিয়া দেখিবেন। গান্ধীজি যতগুলি বিদেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন সেই সব ভাষা হইতে নির্বিচারে নানা শব্দ বলিয়া গেলেন — রাজচন্দ্র যথাক্রমে শব্দগুলি পুনরাবৃত্তি করিলেন। কবির এই ক্ষমতায় তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে ঈর্ষাও জাগিয়াছিল। কিন্তু ঈর্ষা এক কথা শ্রদ্ধা আর-এক। এই স্মৃতিশক্তি দেখিয়া গান্ধীজি ঈর্ষান্বিত হইলেও প্রথমে শ্রদ্ধান্বিত হন নাই। পরে এই মানুষটির অন্তরের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। নিজে হাজার-হাজার টাকার ব্যবসা করিতেন। কিন্তু বেচাকেনার কথা সমাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব লইয়া লিখিতে বসিয়া যাইতেন।

ইঁহার নৈতিক চরিত্রের প্রতি গান্ধীজির আস্থা ছিল গভীর। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন — আধুনিক জগতের তিন জন মনীষী তাঁহার পুরোবর্তী পথের প্রদর্শক, রায়চন্দভাই তাঁহার প্রাণময় সংসর্গের দ্বারা, টলস্টয় এবং রাস্কিন যথাক্রমে তাঁহাদের 'কিংডম্ অফ গড ইজ্ উইদিন্ ইউ' এবং 'আনটু দিস্ লাস্ট' এই দুই গ্রন্থের দ্বারা।

১৫ | উদ্যোগীর লক্ষ্মীলাভ

এইবার সংসারে প্রবেশ করিবার পালা আসিল। বড় ভাইয়ের আশা ছিল অফুরন্ত। ভাই দেশে ফিরিয়াই যে একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া বসিবেন, এই বিষয়টা তিনি অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মতই ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু জগৎ মানুষের কল্পনার পাখায় ভর করিয়া উড়ে না। মানুষের অভিপ্রায় এবং বিধাতার বিধান প্রায়ই একপথে চলে না। এদিকে জাতির কলহ তো বাধিয়াই ছিল। গান্ধীজি দেশে ফিরিয়া আসিলে সেই মালিন্য আবার ঘোলাইয়া উঠিল। তবে এইবার ধর্মরক্ষীরা দুইটি দলে বিভক্ত হইলেন। প্রথম দলটি গান্ধীজিকে জাতিতে টানিয়া লইলেন কিন্তু দ্বিতীয় দল একেবারেই অনমনীয় — কোনোমতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। গান্ধীজির তরফ হইতে অবশ্য ইহাতে কোনো বাধা আসিল না। স্বজাতীয় হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি কোনো আপিল করিলেন না। এই অপ্রতিরোধে শুভ ফলই ফলিয়াছিল। একটা শোরগোল তুলিয়া জাতির দরবারে উঠিতে গেলে বিরোধের পরিমাণ শুধু বাড়িয়াই চলিত। তাহা না করিয়া সমাজের এই অন্যায় দণ্ড স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি সংসারী হইয়া পড়িলেন।

প্রথমেই বাড়ির ছেলেদের শিক্ষার দিকে তাঁহার নজর পড়িল।

নিজের যে শিশুপুত্রটিকে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন তাহার বয়স তখন চার বৎসর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও এক ছেলে ছিল। এই দুইটিকে লইয়া গান্ধীজি রীতিমত একটা ইস্কুল খুলিয়া বসিলেন। শিক্ষার মধ্যে ব্যায়ামচর্চা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহে আহার্য-সংস্কার আরম্ভ হইল। দৈনন্দিন ভোজ্যদ্রব্যের সহিত ওটমিলের পরিজ এবং কোকো সংযুক্ত হইল। বিলাত-প্রত্যাগত ভ্রাতার সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে পরিবারে বিলাতী আদবকায়দা প্রবর্তন করা আবশ্যক ভাবিয়া বড় দাদা ইতিপূর্বেই চীনামাটির কাপ ডিশ প্রভৃতির সহিত যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় গান্ধীজি আসিয়া সংস্কারকার্যে মন দিলেন। জুতা মোজা তো ঘরেই ছিল, তিনি তাহার উপর কোট প্যাণ্টালুন চাপাইয়া গৃহের অধিবাসীদেরও যথাসম্ভব বিলাতী কায়দায় দুরস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

নূতনত্ব কিছু প্রবর্তিত হইল বটে, কিন্তু খরচ বাড়িয়া গেল। অথচ উপার্জন তো শুরুই হয় নাই। রাজকোটে আইনব্যবসায়ের সুবিধা ছিল না। ব্যারিস্টারের ফী উকিলের ফী অপেক্ষা দশগুণ বেশী। এ দিকে ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতাও কিছুমাত্র নাই। এমন অবস্থায় মক্কেল জুটিবে কোথা হইতে।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, বোম্বাই হাইকোর্টে কিছুদিন যাতায়াত করিলে অন্তত ব্যারিস্টারি সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান হইবে। ভারতীয় আইন গান্ধীজির তখনও তেমন রপ্ত হয় নাই — এখানে সে

অভাব পূর্ণ করিবার সুযোগও যথেষ্ট। সকলের উপদেশে তিনি বোম্বাইয়ে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন।

বোম্বাইয়ে আসিয়া তিনি এক সঙ্গী পাইলেন। তাঁহার নাম বীরচন্দ্র গান্ধী। ইনিও সলিসিটরের পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইনি মাঝে মাঝে গান্ধীজিকে বড় বড় উকিলের নানা কাহিনী শুনাইতেন। সার্ ফিরোজ শার শক্তির মূলে ছিল তাঁহার আইনের অগাধ জ্ঞান। এভিডেন্স অ্যাক্ট তো তাঁহার কণ্ঠস্থ। বদরুদ্দিনের সওয়াল জবাব এমনই যে শুনিয়া জজও ভয় পায়।—ইত্যাদি ইত্যাদি। গান্ধীজি এ-সব কথা শুনিয়া মুষড়াইয়া পড়িলেন। বীরচন্দ্র বলিতেন, পাঁচ-সাত বছর ধরিয়া অনেকেই হাইকোর্টে 'ভেরেণ্ডা ভাজিয়া' থাকে। তিন বছর পরেও যদি খরচ চালাইবার মত যোগ্যতা অর্জন করা যায় তবেই যথেষ্ট বলিতে হইবে। এ-সব কথা গান্ধীজির খুবই সত্য মনে হইল। তাঁহার উপার্জন কিছুই হইতেছে না অথচ খরচের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। মনে তাঁহার শান্তি রহিল না। বাড়ির বাহিরে ব্যারিস্টারের নামের প্লেট আঁটিয়া রাখা আর ভিতরে ব্যারিস্টারির জন্য প্রস্তুত হওয়া — ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এমনি অবস্থায় একটি মামলা তাঁহার হাতে আসিল।

কেস্ সংগ্রহ করিবার জন্য উকিল ব্যারিস্টাররা দালালকে কমিশন দিয়া থাকেন—ইহা চিরন্তন রীতি। শোনা গেল তাঁহাকেও দালালি দিতে হইবে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—কিছুতেই

না। টাকা যদি রোজগার না হয় নাই হইবে, তাই বলিয়া অসাধু পথে কখনো যাইব না।

দালালকে কমিশন না দিলেও মামলাটি তাঁহারই হাতে আসিল। ফী বাবদ তিনি ত্রিশ টাকা পাইলেন। প্রতিবাদী পক্ষ হইতে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং জেরা করিবার ভার তাঁহারই। জেরা করিতে উঠিয়া তাঁহার গা কাঁপিতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। মনে হইল যেন তাঁহার সম্মুখে সমস্ত আদালতটাই ঘুরিতেছে। তাঁহার উত্তরজীবনের পরিচয় লাভের পর এ ঘটনা স্বভাবতই একটু কৌতুকপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

যাহাই হউক, সেদিনের মত মামলাটি অন্য একজন আইন-জীবীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। গান্ধীজি তাঁহার গৃহীত ত্রিশ টাকা ফিরাইয়া দিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে স্থির করিলেন পুরাপুরি সাহস সঞ্চয় না হইলে আর মকদ্দমা হাতে লইবেন না। তথাপি দিন চালাইবার মত একটা সংস্থান খুঁজিয়া লওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহ চিরদিনই ছিল। এই সময়ে একটা সুযোগও মিলিয়া গেল। কোনো নাম-করা হাই স্কুলের জন্য পঁচাত্তর টাকা বেতনে ইংরাজী শিক্ষকের একটি আসন শূন্য ছিল—গান্ধীজি ওই পদের জন্য আবেদন করিলেন। যথা সময়ে তাঁহার ডাকও পড়িল। কিন্তু গ্রাজুয়েট নন বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে পথের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গেল। বড় ভাইয়ের সহিত রাজকোটে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সেখানে

ওকালতি করিতেন। ভাইয়ের জন্য কিছু কিছু আরজি লেখার কাজ অন্তত জোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া বোম্বাইয়ের পৃথক খরচের ভারটা তো লাঘব হইবে। নানা দিক ভাবিয়া গান্ধীজি রাজকোটে আসিয়া একটি আপিস খুলিয়া বসিলেন। উদ্‌যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। কিছু দিনের মধ্যেই গান্ধীজির মাসিক আয় সাড়ে-তিন শত টাকায় উঠিল।

টাকার সমস্যা কতকটা মিটিল বটে, কিন্তু নূতন বিপদ বাধিল এক ইংরাজ কর্মচারীকে লইয়া। পোরবন্দরের রাজার রাজ্যলাভের পূর্বে গান্ধীজির বড় দাদা তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। একবার অভিযোগ আনা হইল তিনি রানা সাহেবকে কুপরামর্শ দিয়াছেন। কথাটা পলিটিক্যাল এজেণ্টের কানে উঠিল। এই এজেণ্টের সহিত বিলাতে গান্ধীজির পরিচয় হইয়াছিল। বড় দাদা বলিলেন — এই পরিচয়ের সুযোগ লইয়া তিনি যদি পলিটিক্যাল এজেণ্টকে দুটা কথা বলিয়া দেন তো ব্যাপারটা মিটিয়া যায়। কথাটা অবশ্য গান্ধীজির একটুও পছন্দ হয় নাই—তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন — তথাপি বড় দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত এজেণ্টের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

কিন্তু না গেলেই যে ভাল করিতেন সে কথা বুঝিতে তাঁহার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগিল না। বিলাতের পরিচয়ের কথা উল্লেখ করাতে সাহেব তাহা অস্বীকার করিলেন না কিন্তু এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিলেন যেন পরিচয়ের সুযোগ লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া গান্ধীজি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করিয়াছেন। গান্ধীজি

যদি তাহা বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া চলিয়া আসিতেন তাহা হইলে সব চুকিয়া যাইত। কিন্তু তিনি যে দাদার কাছে কথা দিয়াছেন। কাজেই সাহেবের ওইরূপ ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি দাদার জন্য সুপারিশ করিতে লাগিলেন।

সুপারিশের কথা শুনিয়া ওই ব্রিটিশ কর্মচারীর রাগ তখন শুধু চোখের দৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ রহিল না। তিনি রূঢ় ভাষায় বলিয়া উঠিলেন, যাহা জানাইবার দরখাস্ত করিয়া জানাইবে।

তৎসত্ত্বেও গান্ধীজি সব কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সাহেব তখন পেয়াদাকে ডাক দিয়া গান্ধীজিকে বাহির করিয়া দিবার হুকুম দিলেন। চাপরাশী আসিয়া গান্ধীজিকে হাত ধরিয়া দরজার বাহির করিয়া দিল।

গান্ধীজি ক্ষতবিক্ষত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্মচারীটি কি পদার্থ তাহা বুঝিলেন। কোনো ভদ্রলোক যে এমন বর্বর হইতে পারে, এ তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। ক্রমে ক্রমে বুঝিলেন, এ রাজ্যে বাস করিতে হইলে অপমান লাঞ্ছনা মাথার মুকুট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এখানে থাকিতে হইলে সাহেবের আর্দালিরও খোশামোদ না করিলে চলিবে না।

১৬ | 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক'

ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় সুযোগ মিলিয়া গেল। 'দাদা আবদুল্লা কোম্পানি'-র একটি বিরাট কারবার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। কোর্টে তাঁহাদের এক বড় মকদ্দমা চলিতেছে। দাবি চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের। এই কারবারেরই একজন অংশিদার গান্ধীজিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইবার প্রস্তাব আনিলেন। এক বছর সেখানে থাকিতে হইবে। শর্ত হইল — ইঁহারা গান্ধীজিকে প্রথম শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া, আফ্রিকায় অবস্থানকালীন যাবতীয় খরচ এবং তদুপরি পারিশ্রমিক বাবদ একশ পাঁচ পাউণ্ড দিবেন।

এই রকম এক সুযোগ পাওয়ায় তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। রাজকোট হইতে বোম্বাই আসিলেন, সেখানে হইতে জাহাজে উঠিতে হইবে। আবদুল্লা শেঠের বোম্বাই এজেন্ট জাহাজের টিকিট কিনিয়া দিবেন — পূর্ব হইতেই সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু স্টীমারে কেবিন খালি পাওয়া গেল না। ডেকে জায়গা ছিল, কিন্তু সেদিনকার সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিস্টার গান্ধী সাহেব তো আজিকার গান্ধীজি ছিলেন না, ডেকে যাইবেন কি করিয়া? তখন তিনি প্রথম শ্রেণী ছাড়া চড়িতেনই না।

আজিকার গান্ধীজি সম্বন্ধে একটা গল্প এই প্রসঙ্গে মনে

পড়িল। এখন তো তিনি তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন রেলগাড়িতে চড়েন না, সে কথা সকলেই জানে। একবার কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,— মহাত্মাজি, আপনি রেলগাড়িতে থার্ড ক্লাসে চড়েন কেন ?

গান্ধীজি মৃদু হাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন,— কি করি বল ? ফোর্থ ক্লাস যে নাই।

এটা হইল একালকার কথা, আর তিনি আফ্রিকায় যখন প্রথম যাইতেছিলেন সে হইল অর্ধ শতাব্দীরও আগেকার ইতিহাস। তখন রেলে স্টীমারে প্রথম শ্রেণীতে না গেলে তাঁহার মর্যাদার হানি হইবে বলিয়া মনে করিতেন। যাহা হউক, সেই সেকালেই আবার ফিরিয়া যাই।

স্টীমারে না যাইতে পারিলে একমাস বোম্বাইতে বসিয়া থাকিতে হইবে। সেটা তিনি ইচ্ছা করিলেন না। তিনি গিয়া স্বয়ং জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহিত দেখা করিলেন। ক্যাপ্টেনের সহিত কথাবার্তা হইল। গান্ধীজির সহিত কথা বলিয়া ক্যাপ্টেন খুশী হইলেন। কেবিনে স্থান একটিও ছিল না। কিন্তু তাঁহার নিজের কামরায় একটা বার্থ খালি ছিল। তাহাতে প্যাসেঞ্জার লওয়া হইত না। তিনি গান্ধীজিকে সেই বার্থে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন।

মে মাসের শেষের দিকে জাহাজ আসিয়া নাটালে পৌঁছিল। আবদুল্লা শেঠ জাহাজঘাটে আসিয়াছিলেন। তিনি গান্ধীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইলেন। জাহাজ হইতে নামিতে না

নামিতেই এই বিষয়টা তাঁহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে নাটালে ভারতীয়দের সম্মান নাই। বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবদুল্লা শেঠের পরিচিত ইউরোপীয়রাও তাঁহার সহিত বেশ একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়াই আলাপ করিতেছিলেন।

জনতার মধ্যে পথ করিয়া গান্ধীজি বাড়ি পৌঁছিলেন। দাদা আবদুল্লার পাশের ঘরেই তাঁহার স্থান হইল। উভয়ের কেহই কাহাকেও বুঝিতে পারেন না। শেঠজির ভাই যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন তাহা পড়িয়া আবদুল্লা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। গান্ধীজির সাহেবী চালের জন্য খরচ যে দ্বিগুণ লাগিবে! তিনি ভাবিলেন, ভাই তাঁহার জন্য একটি 'শ্বেত হস্তী' পাঠাইয়াছেন। এদিকে সদ্য সদ্য তাঁহাকে দিয়া করাইবার মত কোনো জরুরি কাজও ছিল না। তাঁহার মকদ্দমা চলিতেছিল ট্রান্সভালে। এত তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়া লাভ নাই। কাজেই গান্ধীজি কিছুদিনের জন্য নাটালের বন্দর ডারবানেই রহিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত আবদুল্লা শেঠের পরিচয় ঘনীভূত হইতে হইতে ক্রমে সৌহার্দ্যে পরিণত হইল। কয়েক দিন পরে দাদা আবদুল্লা তাঁহাকে ডারবানের কোর্টে লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েক জনের সহিত পরিচয় হইল। তাহার পর আবদুল্লা শেঠ আদালত-কক্ষে তাঁহার উকিলের আসনের পার্শ্বে গান্ধীজির জন্যও একটি বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। কিন্তু এই বহুদূরবর্তী দেশেও তাঁহার আগমনের আভাস পাইয়া অদৃষ্ট যেন

পূর্ব হইতেই একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। কোর্টেই তাহার নমুনা মিলিল।

গান্ধীজির মাথায় ছিল পাগড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি গান্ধীজিকে পাগড়ি খুলিতে হুকুম দিলেন। গান্ধীজি আদেশ অমান্য করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কেন যে হাকিম এইরূপ অদ্ভুত আদেশ দিলেন সে কথা তিনি আবদুল্লা শেঠের নিকট পরে শুনিয়াছিলেন। আদালতে প্রবেশ করিতে হইলেই ভারতবাসীকে মাথার পাগড়ি খুলিতে হইত। মুসলমানী পোশাক পরা থাকিলে পাগড়িসুদ্ধ আদালতের ভিতর প্রবেশ করিলে আপত্তি নাই; কিন্তু অন্য পোশাক হইলেই এই নিয়ম।

তাহার মূল কারণটা এই,— ডারবানে বহুসংখ্যক ভারতীয় মজুর ছিল। ইংরাজেরা তাহাদের কুলি বলিত। ধীরে ধীরে 'কুলি' শব্দটা মজুর হইতে 'ভারতীয়' এই কথারই প্রতিশব্দ রূপে প্রযুক্ত হইতে থাকে। এমন কি ভারতীয় ব্যাপারী বা ব্যবসায়ীদিগকে ওখানে 'কুলি ব্যাপারী' বলাই রেওয়াজ হইয়া দাঁড়ায়। স্বয়ং গান্ধীজিকেও ওখানকার ইংরাজেরা 'কুলি ব্যারিস্টার' বলিতে লাগিল।

যাহাই হউক, পাগড়ি খুলিয়া প্রবেশ করা অপমানের সামিল বলিয়া গান্ধীজি স্থির করিলেন বিলাতী টুপিই ব্যবহার করিবেন। কিন্তু আবদুল্লা শেঠের উপদেশে তাঁহার সে সংকল্প পরিহার করিতে হইল। তিনি বলিলেন এমনভাবে নীরবে একটা অর্থহীন

অপমান সহ্য করা অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর। গান্ধীজি তখন কোর্টের ঘটনাটি সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্পষ্ট ভাষায় এই অভিমত জানাইয়া দিলেন যে পাগড়ি পরিয়া কোর্টে প্রবেশ করার মধ্যে কিছুমাত্র অন্যায় নাই।

ইহাতে বেশ একটা শোরগোল পড়িয়া গেল। সংবাদপত্রে এই বিষয়টি লইয়া গুরুতর আলোচনা চলিল। সম্পাদকমণ্ডলী 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক' এই শিরোনাম দিয়া তাঁহার বিবরণী মুদ্রিত করিলেন। এই ক্ষুদ্র বিসংবাদের একটা বিচিত্র ফল ফলিল এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিবার কিছুদিনের মধ্যেই ব্যারিস্টার গান্ধীর নাম সে দেশে অতিশয় পরিচিত হইয়া গেল।

এই কুলি জাতিটার দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসেরও অধম। তাহারা ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে পারিত না। উচিত মূল্য দিলেও রেলে উচ্চ শ্রেণীর কামরায় আরোহণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আইন-আদালতে ইহাদের কতটা আশ্রয় মিলিত সে কথা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজি ক্রমে ক্রমে সবই বুঝিলেন। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের দুঃখে দুর্দশায় তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। এমন সময় প্রিটোরিয়ায় তাঁহার ডাক পড়িল।

১৭ | কালা ও গোরা

আবদুল্লা শেঠের নিকট মকদ্দমার বিবরণ বুঝিয়া লইয়া গান্ধীজি কয়েক দিন পরে ডারবান হইতে রওনা হইলেন। তাঁহার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটা হইল। আবদুল্লা শেঠ বিছানার জন্যও টিকিট লইতে বলিলেন, কিন্তু গান্ধীজি তাহা লইতে চাহিলেন না। শেঠ মহাশয় বলিলেন, টাকা পয়সার জন্য চিন্তা করিবেন না। যখনই প্রয়োজন হইবে অসংকোচে খরচ করিবেন। অনর্থক কষ্ট করিয়া লাভ কি? গান্ধীজি তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় দিলেন।

রাত্রি নয়টার কাছাকাছি গাড়ি নাটালের রাজধানী ম্যারিজ-বুর্গে পৌঁছিল। এইখানেই রেলের লোকেরা বিছানা দিতে আসে। গান্ধীজিকেও তাহারা বিছানার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি প্রয়োজন নাই বলিয়া কুলিকে ফিরাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে একজন শ্বেতকায় আরোহী তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিল। লোকটি বারকয়েক গান্ধীজিকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল এবং মিনিটকয়েক পরেই দুইটি রেলকর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। উহাদের একজন তাঁহাকে বলিল,—নামিয়া আইস, তোমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে হইবে।

গান্ধীজি ভাবিলেন — এ জুলুম তো মন্দ নয়। সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর ভ্রমণ করিতে হইবে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়! তিনি বলিলেন, — আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।

তাহারা বলিল, — ও-সব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও, মানে মানে এখান হইতে নামিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া উঠ।

গান্ধীজি নড়িলেন না।

কালো লোকটার স্পর্ধা দেখিয়া শ্বেতকায় রেলকর্মচারীগুলা অবাক হইয়া গেল। তাহারা বলিল, — আবার বলিতেছি, কথা শুন, নহিলে পুলিস ডাকিয়া নামাইব।

গান্ধীজি বলিলেন, — বেশ, তবে তাহাই হউক। স্বেচ্ছায় আমি নামিব না।

রেলকর্মচারীরা কোনো ভারতীয় লোকের মুখে এরূপ কথা ইতিপূর্বে কখনো শুনে নাই। তাহারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া পুলিসকে ডাকিল। অমনি একজন পুলিস কনস্টেবল আসিয়া গান্ধীজিকে ধাক্কা দিয়া কামরা হইতে বাহির করিয়া দিল। তাঁহার মালপত্রও প্লাটফর্মে টানিয়া ফেলিয়া দিল।

অপমানে দেহমন জর্জরিত। এদিকে শীতকাল। রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল শীতও যেন হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। গান্ধীজি ক্ষুদ্র স্যুটকেসটি হাতে লইয়া স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে যাইয়া বসিলেন। হিমে সর্বাঙ্গ জমিয়া যাইতেছিল। ওভারকোটটা অন্যান্য জিনিসের সহিত বাঁধা রহিয়াছে। রেলকর্তৃপক্ষই তাহার বর্তমান রক্ষক। চাহিতে সাহস হইল না। অপমান করিতে

ইহাদের এতটুকুও বাধে না, কি জানি আবার কি বলিয়া বসিবে!

গান্ধীজি সেই বিশ্রামকক্ষে বসিয়া নিজের কর্তব্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, দেশে ফিরিয়া যাই। তখনই মনে হইল, তাহা হইলে এই যে মিথ্যা অনাচার আগাছা পরগাছার মত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার কোনো প্রতিকার হইবে না। তাহা ছাড়া কর্তব্য তো সমাধা করিতে হইবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি সাধ্য হয়, বর্ণবিদ্বেষের এই দুর্নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করিবেন।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসিয়াই সে-রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। ভোর হইতেই আবদুল্লা শেঠের নিকট সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়া পাঠানো হইল। আবদুল্লা জেনারাল ম্যানেজারকে খবর দিলেন। তিনি রেলকর্মচারীদের আচরণই সমর্থন করিলেন — তবে এটুকু আশ্বাস দিলেন যে অতঃপর গান্ধীজির নিরাপদ ভ্রমণের জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

সকাল হইল। আবদুল্লা শেঠ ইতিমধ্যেই ম্যারিজবুর্গের ভারতীয় অধিবাসীদের নিকট তার করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। গান্ধীজির লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া বলিলেন, অমন শত শত অপমানের কাহিনী আমাদের জীবনের পাতায় পাতায় অঙ্কিত আছে। রেলগাড়িতে আমাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীই নির্দিষ্ট।

কথায় কথায় বেলা গড়াইয়া আবার রাত্রি নামিল। আবার

সেই প্রিটোরিয়ার ট্রেন। এবার পূর্ব হইতেই তাঁহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। তিনি নিরাপদে পরদিন সকালবেলা চার্লস্‌টাউনে পৌঁছিলেন।

সেখান হইতে যাইতে হইবে জোহান্‌স্‌বার্গে। চার্লস্‌টাউন ও জোহান্‌স্‌বার্গের মধ্যে রেলপথ ছিল না। প্রচলিত বাহন ছিল ঘোড়ার 'সিগরাম'। এই দীর্ঘ গাড়িগুলির উভয় পার্শ্বে যাত্রীরা সার বাঁধিয়া বসিত। চালকের পাশে ছাদের উপরে বসিত কণ্ডাক্টর। গান্ধীজিকে কৃষ্ণদেহ দেখিয়া কণ্ডাক্টর ভিতরে আসিয়া বসিল, গান্ধীজিকে বসিতে হইল চালকের পার্শ্বে। এ যে শুধু মাত্র মিথ্যা লাঞ্ছনা, এ কথা বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। কিন্তু বচসা আরম্ভ হইলে হয়তো সিগরাম চলিয়া যাইবে। এদিকে যে কার্যে অবতরণ করিয়াছেন তাহাতে সমূহ বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা। সুতরাং এই অপমানটুকু নির্বিচারেই মানিয়া লইলেন।

ইহারই ক্ষণকাল পরে কণ্ডাক্টর চালকের নিকট একটি চট চাহিয়া লইয়া পাদানের উপর বিছাইয়া দিয়া গান্ধীজিকে বলিল, — ওইখানে বস।

তাহার নিজের একটু চুরুট টানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। সে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসিয়া ধূমপান করিবে। সুতরাং গান্ধীজিকে তাহার এবং চালকের পদতলে বসিতে হইবে। এই তাহার বক্তব্য।

সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। গান্ধীজি শান্তভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। লোকটার তাহা সহ্য হইল না। সে অকথ্য

ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল এবং নির্মমভাবে কিল চড় ঘুষি মারিতে লাগিল। তথাপি তিনি আসন ছাড়িলেন না। প্রাণপণ বলে দুই হাতে গাড়ির রেলিং আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা ভিতর হইতে একজন আরোহী করুণা প্রকাশ করিয়া কণ্ডাক্টরকে বলিলেন,—উহাকে ওইখানেই বসিতে দাও না বাপু। ও তো অন্যায় কিছু বলে নাই।

সিগরামওআলা অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। তবে দুষ্কৃতির সমর্থন না পাইয়া বোধ করি একটু দমিয়া গেল। শাসাইয়া বলিল, — স্টাণ্ডারটনে চল একবার ; সেখানে গেলে মজাটা দেখিতে পাইবে। স্টাণ্ডারটন হইল সিগরাম বদল করিবার কেন্দ্র।

এখানে গাড়ি পৌঁছিল ভোরবেলা। আবদুল্লা শেঠের তার পাইয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই গান্ধীজিকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আনুপূর্বিক শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন — ব্যাপারটা সিগরাম কোম্পানিকে জানানো দরকার। গান্ধীজি এজেন্টের নিকট একটি চিঠি লিখিয়া দিলেন। এজেন্টকে অনুরোধ করা হইল অতঃপর তিনি যেন গাড়ির ভিতর বসিয়া যাইতে পারেন।

এজেন্ট জবাব দিলেন, সেইরকম ব্যবস্থাই হইবে। গান্ধীজি বিনা হাঙ্গামায় সেদিন রাত্রিতে জোহান্‌স্‌বার্গে পৌঁছিলেন। অপরিচিত শহর, লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

সুতরাং একাকীই একটি হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু 'কুলি' বলিয়া সেখানে তাঁহার আশ্রয় মিলিল না।

মহম্মদ কাসেম আলী নামক জনৈক ভারতীয়ের ঠিকানা সঙ্গে ছিল। গাড়োয়ানকে সেই ঠিকানায় গাড়ি হাঁকাইতে বলিলেন। এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার অভাব হইল না।

এখান হইতে প্রিটোরিয়া যাইতে হইবে। স্থির হইল গান্ধীজি পরের দিনই প্রিটোরিয়া যাত্রা করিবেন। জোহান্‌স্‌বার্গ হইতে প্রিটোরিয়ার দূরত্ব সাঁইত্রিশ মাইল। এই পথ রেলেই যাইতে হইবে।

এদিককার অবস্থা আরও শোচনীয়। কথাপ্রসঙ্গে গান্ধীজি জানিতে পারিলেন, ভারতীয়দিগকে প্রথম শ্রেণীর টিকিটই বিক্রয় করা হয় না। তাহা শুনিয়া গান্ধীজি স্টেশনমাস্টারকে একটি চিঠি লিখিলেন। যথাসময়ে স্টেশনে আসিলে স্টেশন-মাস্টার বলিলেন, প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে তাঁহার ব্যক্তিগত আপত্তি নাই তবে মাঝরাস্তায় গার্ড যদি তাঁহাকে নামাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে চালান দেয় তবে মাস্টার সাহেবকে যেন হাঙ্গামায় জড়িত না করেন, কেননা সেক্ষেত্রে তাঁহার চাকরিটা লইয়া টানাটানি পড়িবে।

স্টেশনমাস্টারকে আশ্বস্ত করিয়া গান্ধীজি গাড়িতে উঠিলেন। একজন ইংরেজ সহযাত্রীও এই কামরায় বসিয়া ছিলেন। যথা-সময়ে গার্ড টিকিট দেখিতে বাহির হইল। গান্ধীজিকে প্রথম শ্রেণীতে দেখিয়া বলিল, — তৃতীয় শ্রেণীতে যাও।

গান্ধীজি তাঁহার টিকিট দেখাইলেন।

সে বলিল,—প্রথম শ্রেণীর টিকিট বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইতে হইবে। ইংরেজ সহযাত্রীটি তাহাকে ধমকাইয়া নিবৃত্ত করিলেন। নিরুপায় গার্ড মুখ কালো করিয়া বলিল,— আপনার যদি কুলির সঙ্গে বসিতে ইচ্ছা হয় তো বস্থন, আমার কি?

রাত্রি সাড়ে-আটটায় গাড়ি প্রিটোরিয়ায় পৌঁছিল। স্টেশনে ঝাপসা ঝাপসা আলো জ্বলিতেছিল। স্পষ্ট করিয়া কিছুই চোখে পড়ে না। গান্ধীজি ভাবিয়াছিলেন আবছুল্লা শেঠের উকিলের তরফ হইতে নিশ্চয় তাঁহার জন্য কেহ অপেক্ষা করিবে। স্টেশনের লোকচলাচল ক্রমশ বন্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ আসিল না।

গান্ধীজি এই নির্বান্ধব স্থানে আসিয়া অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, কোনো হোটেলের ঠিকানা পর্যন্ত জানা নাই। টিকিট-কালেক্টরকে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কিছু স্থবিধা হইল না। নিকটেই একজন আমেরিকান নিগ্রো ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিই উপযুক্ত হোটেল খুঁজিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন।

এইরূপ সাহায্যের প্রস্তাব এতটাই অস্বাভাবিক যে, গান্ধীজিরও প্রথমটা সন্দেহ হইয়াছিল, মানুষটার হয়তো কোনো ছুরভিসন্ধি থাকিতে পারে। কিন্তু অজানা অচেনা এই শহরে একাকীই বা তিনি কি করিবেন? ধীরে ধীরে ইহাকে অনুসরণ

করিয়া একটি ক্ষুদ্র হোটেলে আসিয়া উঠিলেন। এখানে তাঁহাব আশ্রয় মিলিল।

আবদুল্লা শেঠের উকিলেব নাম এ. ডব্লিউ. বেকার ; পরদিন সকালেই গান্ধীজি ইঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। প্রিটোরিয়ায় বর্ণবিদ্বেষ প্রবল, এ কথা তিনিও বলিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গান্ধীজি শুনিলেন,— এই বর্ণবিদ্বেষের জন্য ভারতীয়ের পক্ষে থাকিবার স্থান সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। যাহাই হউক, ইঁহারই চেষ্টায় গান্ধীজি একটি বাসা পাইলেন। এক দবিদ্র মহিলা বেকারের অনুরোধে গান্ধীজিকে তাঁহার গৃহে স্থান দিতে সম্মত হইলেন।

হাতে তখন যথেষ্ট অবসর। এই সময়টা তিনি বই পড়িয়া কাটাইতেন। বেকার সাহেব উকিল হইলেও গৃহী ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহার সহিত মাঝে মাঝে খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাও চলিত। গান্ধীজির ধর্মলিপ্সা বেকার প্রথম দর্শনেই টের পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন গান্ধীজিকে তাঁহার প্রার্থনাসভায় আমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে কয়েকজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইঁহাদের মধ্যে মিস হ্যারিস, মিস গেব্ এবং মিস্টার কোট্স্-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

মিস গেব্ এবং মিস হ্যারিস — এই দুইজন ভদ্র মহিলাই প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াছেন। মিস্টার কোট্স্ যুবক। বন্ধুত্বটা ইঁহারই সহিত পাকা হইল। এই দুইটি উৎসাহী বন্ধুর ভিতর পুস্তক বিনিময় হইত। মাঝে মাঝে সমালোচনাও চলিত।

গান্ধীজির গলায় বৈষ্ণব কণ্ঠী দেখিয়া একদিন কোট্‌স্‌ বলিলেন —
এটা কুসংস্কারের চিহ্ন। বলেন তো ছিঁড়িয়া ফেলি।

কণ্ঠীটি গান্ধীজির মায়ের দান, অত সহজে ছিঁড়িয়া ফেলিবার
নয়। কিছুটা বচসার পর সে প্রসঙ্গ বন্ধ হইল।

১৮ | আত্মশক্তির উদ্বোধন

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, প্রিটোরিয়াতেই তাঁহার স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রথম তূর্য বাজিয়া উঠে। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহের অবধি ছিল না, কিন্তু ট্রান্সভালের রাজনৈতিক অবস্থাও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-সব ভারতীয় মজুর বা ব্যবসায়ীদের বাস ছিল তাহাদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। সরকারের হাতে ইহাদের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ফুটপাথের উপর উঠিলে পর্যন্ত তাহাদের কৈফিয়ত দিতে হইত। রাত্রি নয়টার পর কোনো ভারতীয় প্রিটোরিয়ার পথে বাহির হইতে পারিত না। পুলিসের নিষেধ ছিল। ইহাদের বাসা বাঁধিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা ছিল, সে সীমানার বাহিরে যাহারা বাস করিতে যাইত তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। এত দুঃখ এত দুর্ভাগ্য বহন করিয়াও ওখানকার ভারতীয়গণ একতাবদ্ধ ছিলেন না। একের অপমানে অন্যে লজ্জা পাইতেন না। একের আহ্বানে অন্যে সাড়া দিতেন না।

গান্ধীজি বুঝিলেন সর্বাগ্রে এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় জনগণকে সম্মিলিত করিয়া তাহাদের আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রিটোরিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে শেঠ তৈয়ব হাজি মহম্মদের

প্রতিপত্তি সর্বাধিক। তাঁহাকে গান্ধীজি অন্তরের কথাটা খুলিয়া বলিলেন। স্থির হইল, একটি সভায় গান্ধীজি তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিবেন।

মহম্মদ হাজি যুসবের বাড়িতে সভা বসিল। গান্ধীজি ধীরে ধীরে শ্রোতাদের সম্মুখে ভারতীয়দের অপমানের করুণ চিত্রটি তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন — ইহার প্রতিকার করিতে হইলে একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে। আশ্বাস দিলেন — তিনি নিজে বিনা বেতনে ইহার জন্য যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবেন।

এ আবেদন নিষ্ফল হইল না। গান্ধীজিকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিবার জন্য অনেকেই অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ইংরাজী জানিতেন না। গান্ধীজি তাঁহাদের বলিলেন, বিদেশে এই ভাষাটি জানা থাকিলে কাজের অনেকটা সুবিধা হইবে। সেইজন্য তিনি সকলকে এই ভাষা শিখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনজন শিখিতে রাজি হইলেন, তাহাও আবার বিচিত্র শর্তে। গান্ধীজি তাঁহাদের সুবিধামত সময়ে বাড়ি গিয়া পড়াইয়া আসিবেন। দায় যেন তাঁহারই। কিন্তু তিনি তাহাতেই রাজি হইলেন। এই শিক্ষার ফলে সাত-আট মাসের মধ্যেই ইঁহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এদিকে সভার ফলও মন্দ হইল না। গান্ধীজি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত চিঠিপত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। শাসনের রাশ একটু ঢিলা হইল। কর্তৃপক্ষ জানাইলেন, অতঃপর ভাল পরিচ্ছদ পরা থাকিলে ভারতবাসীরাও প্রথম এবং দ্বিতীয়

শ্রেণীতে ভ্রমণের অনুমতি পাইবে। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ সুবিধা হইল না। কারণ ভাল পরিচ্ছদ কি, তাহা স্থির করিবে কে? স্টেশনমাস্টারের মর্জিতে যে পরিচ্ছদ মন্দ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে তাহার অধিকারী তো উচ্চ শ্রেণীর কামরায় উঠিতে পাইবে না।

এদিকে ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিতও পরিচয় হইয়াছিল। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের ভারতীয়দের কিরূপ নির্মমভাবে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছিল, এ খবর তিনি তাঁহার নিকটেই পাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে ইহার পূর্ণ বিবরণ আছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে একটি আইন পাস করিয়া ফ্রী স্টেটের সমস্ত স্বত্ব ছিনাইয়া লওয়া হয়। হোটেলের চাকর এবং কুলি মজুররাই শুধু এই আইনের আমল হইতে বাদ পড়িয়াছিল। বোধ হয় তাহাদের না হইলে চলে না, এইজন্য। বহু বছর ধরিয়া যাহারা বুকের রক্ত দিয়া সাধের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছিল নামমাত্র খেসারৎ দিয়া তাহাদেরও বিদায় করা হইল।

ইহারই কিছুদিন পূর্বে আর কয়েকটি আইন তৈয়ার হয়। তাহাতে স্থির হয়, অতঃপর সব ভারতবাসীকেই তিন পাউণ্ড হিসাবে প্রবেশ ফী দিতে হইবে। ভোটের অধিকার তাহারা পাইবে না। নির্দিষ্ট অঞ্চল ব্যতীত ঘর বাঁধিবার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে না। ফুটপাথের উপর দিয়া চলা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাত্রি নয়টার পর বিনা লাইসেন্সে পথে বাহির হইলে তাহাদের হাজতে যাইতে হইবে। যাহারা এই

বন্দীদশা সহ্য করিতে প্রস্তুত তাহারাই সেখানে থাকিতে পারিবে।

এই শেষের আইনটি লইয়া গান্ধীজি একটু বিপদে পড়িলেন। তিনি কোট্‌সের সহিত রাত্রে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতেন। বাড়ি ফিরিতে দেরি হইয়া যাইত। মনে মনে শঙ্কা জাগিত— যদি পুলিসে ধরে? কোট্‌স নিজের ভৃত্যদের লাইসেন্স দিয়াছিলেন কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে তো সে সম্পর্ক নয়। লাইসেন্স দিবেন কেমন করিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া কোট্‌স্ গান্ধীজিকে লইয়া সরকারী উকিল ডাক্তার ক্রাউজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে একই 'ইন্' হইতে ব্যারিস্টার হইয়াছেন। ব্যাপার শুনিয়া ক্রাউজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যারিস্টারকে রাত্রি নয়টার পর বাহির হইতে হইলে পুলিসের অনুমতি লইতে হইবে — কোনও ভদ্রলোকই এই দুর্নীতি সহ্য করিতে পারে না। ক্রাউজ গান্ধীজিকে সরাসরি লাইসেন্স দিলেন না — একটি চিঠি লিখিয়া দিলেন যে গান্ধীজির ইচ্ছামত ভ্রমণে পুলিস যেন কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি না করে।

ফুটপাথে ভ্রমণের সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিলতররূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গান্ধীজি প্রিটোরিয়ায় আসিয়াছিলেন মকদ্দমা উপলক্ষে, এইবার সেই দিকে মন দিলেন। চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের দাবি। সহজে শেষ হইবার নয়, কিন্তু তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে মকদ্দমাটি আপসে নিষ্পত্তি হইল।

গান্ধীজির আফ্রিকাবাস এক বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, যে উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে। এবার তাঁহার ফিরিবার পালা। দাদা আবদুল্লা গান্ধীজিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন। ভোজ পুরাদমে চলিতেছিল। ইতিমধ্যে একজন 'নাটাল মার্কারি' পত্রিকার একটি কপি আনিয়া গান্ধীজির হাতে দিলেন। এই সংবাদপত্রের একাংশে মুদ্রিত একটি ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তি পড়িয়া গান্ধীজি জানিলেন নাটালের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের যে ভোটের অধিকার ছিল তাহা রদ হইয়া যাইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের তখনও কিছু ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল — এই আইনটি পাস হইলে তাহার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হইবে। ইহারই প্রতিকারকল্পে গান্ধীজিকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। বন্ধুরা তাঁহাকে আসিতে দিলেন না। ভোজের আসর উঠিয়া গিয়া সেই উৎসবরজনীতে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইল।

বিলের দ্বিতীয় শুনানি তখন শেষ হইয়াছে। সভায় এমন আলোচনাও উঠিয়াছিল যে এখনো ভারতীয়দের তরফ হইতে কোনো আপত্তি উঠে নাই, সুতরাং ইহারা যথার্থই এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার যোগ্য। বিলের কথা তাঁহারা এ-পর্যন্ত শোনেন নাই, প্রতিবাদ আসিবে কোথা হইতে? গান্ধীজি কথাটা সভায় সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে তার করা হইল — বিলের

সম্বন্ধে আলোচনা যেন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়। উত্তর আসিল দুই দিনের জন্য প্রস্তাব মুলতুবি থাকিবে। সেই রাত্রেই একটা আবেদনপত্র রচিত হইল। কিন্তু শুধু আবেদনপত্র হইলেই চলে না। সাধারণের সম্মতি লওয়া প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবকেরা স্বাক্ষর গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে আবেদন পাঠানো হইল। গান্ধীজি ইতিমধ্যেই ইহার একটি কপি সংবাদপত্রে ছাপিতে দিয়াছিলেন — সেখানেও ইহার অনুকূল সমালোচনা হইল।

কিন্তু বিল যথাসময়ে পাস হইয়া গেল। তথাপি এই সংঘবদ্ধ জনতা যে রাজদ্বার পর্যন্ত প্রতিবাদের আবেদন পাঠাইতে পারিয়াছে — এই ভাবিয়া সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার মধ্যে একটা উদ্দীপনা আছে। তাই পরাজয়ে কেহ দমিলেন না। স্থির হইল ঔপনিবেশিক মন্ত্রী লর্ড রিপনের কাছে প্রতিবাদের আবেদন পাঠাইতে হইবে। গান্ধীজি স্বয়ং আবেদনের খসড়া তৈয়ারি করিয়া দিলেন। স্বাক্ষর লইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহের অবধি ছিল না। অবশেষে একমাস পরে দশ হাজার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনটি লর্ড রিপনের কাছে পাঠানো হইল।

আপাতত গান্ধীজির কর্তব্য সম্পন্ন হইল। তিনি দেশে ফিরিতে চাহিলেন — কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা কেহই তাঁহাকে ছাড়িলেন না। বিলের প্রতিবাদে ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনার স্রোত বহিয়াছিল। কিন্তু এ-সব কার্যে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

তাঁহারা বলিলেন — ঔপনিবেশিক মন্ত্রী কি উত্তর পাঠাইবেন, তাহার কোনো ঠিকানা নাই। আমাদের নায়ক আপনি। আপনি চলিয়া গেলে আমাদের সব সংকল্প ঘুচিয়া যাইবে।

কথাগুলি মিথ্যা নয়। সুতরাং গান্ধীজি এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। সমিতি স্থির করিয়াছিলেন, গান্ধীজি যতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিবেন ততদিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাকে তিনশত পাউণ্ড হিসাবে বছরে সাহায্য করা হইবে, কিন্তু গান্ধীজি জনসেবার পরিবর্তে এই পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না।

তাহা ছাড়া তিনি ভাবিয়াছিলেন পারিশ্রমিকের প্রয়োজনই বা কি ? ওকালতি ব্যবসা শুরু করিলে তাঁহার অর্থাভাব ঘুচিবে। এই আশায় তিনি নাটালের আদালতে নাম রেজিস্ট্রি করিয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু এ কাজ তাঁহার পক্ষে গৌণ, আসল যে কাজে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন— তাহাকে পূর্ণভাবে সফল করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

১৯ | নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী ভারতীয়দের অন্তরে যেন স্বাধীনতার হোমানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজি বুঝিলেন, ইহাকে অনির্বাণ রাখিতে হইলে একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা দরকার। আবদুল্লা শেঠের সহিত আলোচনা হইল। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, একটি সংঘ গঠন করা হউক এবং তাহার নাম দেওয়া হউক 'কংগ্রেস'। তাহাই হইল। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মে 'নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' স্থাপিত হইয়া গেল।

প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী খুবই সাদাসিধা। চাঁদা একটু বেশী পরিমাণে ধরা হইয়াছিল। প্রতিমাসে কমপক্ষে পাঁচ শিলিং। যাঁহারা পারিবেন তাঁহারা আরও বেশী দিবেন। চাঁদা আদায়ের ভার গান্ধীজির হাতেই পড়িয়াছিল। তিনিই ছিলেন সেক্রেটারি। সভ্য সংগ্রহের কার্যে সহকর্মীরা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল।

ভারতীয়দের সেবার জন্য শিক্ষিত যুবকদের লইয়া গান্ধীজি একটি সংঘ গঠন করিলেন। এখানে সাময়িক সমস্যা লইয়া বক্তৃতা হইত। অনেকে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। একটি ছোটখাটো লাইব্রেরিও ইহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। এই সময়েই ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের দুঃখ-

কষ্টের প্রকৃত কাহিনী জানাইবার জন্য প্রচারকার্য আরম্ভ হয়। গান্ধীজি এই উদ্দেশ্যে দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। প্রথমটির নাম 'দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী প্রত্যেক ইংরেজের প্রতি নিবেদন', দ্বিতীয়টি 'ভারতীয়দের ভোটের অধিকার সম্পর্কে একটি নিবেদন'। পাঠকবর্গের নিকট বই দুইটি যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিল।

সমসাময়িক একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। গান্ধীজি তখন মাত্র দুই-তিন মাস হইল ওকালতি শুরু করিয়াছেন। কংগ্রেসও সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমনি সময়ে একদিন একটি মাদ্রাজী মজুর আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পাগড়ি খুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দেহ কম্পমান, সম্মুখের দুইটি দাঁত ভাঙিয়া যাওয়ায় মুখ দিয়া অবিরল ধারায় রক্ত পড়িতেছে।

তিনি প্রথমেই বলিলেন,—পাগড়ি খুলিলে কেন ? পাগড়ি মাথায় উঠাও।

লোকটা তবু সাহস করিয়া মাথায় পাগড়ি তুলিতে পারিতেছিল না। তাহা দেখিয়া গান্ধীজি তাহাকে আবার অভয় দিলেন। সে দ্বিধার সহিত পাগড়ি পরিল। গান্ধীজি দেখিলেন পাগড়ি মাথায় পরিতে পাইয়া লোকটার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গান্ধীজি বুঝিলেন এ আনন্দ কিসের। সেই সামান্য গিরমিটিয়ারও যে একটা মর্যাদা আছে এবং সে মর্যাদা অন্যে স্বীকার করে, তাহাকেও অন্যে সম্মান দেয়, এ-কথা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই! আফ্রিকায় বাস করিয়া সে এইটাই

দেখিয়া আসিয়াছে যে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে মাথার পাগড়ি খুলিয়া দাঁড়াইতে হয়। গান্ধীজি সাহেব নহেন তাহা সে জানিত কিন্তু তিনিও তো সম্মানের পাত্র। তাই সে তাঁহার সম্মুখে অনাবৃতমস্তকে উপস্থিত হইয়াছিল।

যাহাই হউক, প্রশ্ন করিয়া তিনি লোকটির নিকট যাহা শুনিলেন তাহা এই :— তাহার নাম বালসুন্দরম্। সে এক ধনী গোরার অধীনে কাজ করিত। কোনো কারণে মনিব সাহেব চটিয়া গিয়া উন্মত্তের মত তাহাকে প্রহার করিয়াছে।

গান্ধীজি প্রথমেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইলেন এবং তাহা লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রভুটিকে তলব দিলেন — কিন্তু গান্ধীজি সে যাত্রা সাহেবকে ক্ষমা করিলেন। মাদ্রাজী ভৃত্যটিকে আর একজন সাহেবের অধীনে চাকরি দেওয়া হইল।

গিরমিটিয়াদের মধ্যে গান্ধীজির প্রতিষ্ঠা এইবার শতগুণে বাড়িয়া গেল। এই উৎপীড়িত জাতিটার হইয়া লড়াই করিবার জন্য যে অন্তত একজন লোকও আছে, এই কথাটাই ইহাদের সমাজে একটা প্রচণ্ড সাড়া জাগাইয়া তুলিল।

২০ | সবুজ বই

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে নাটাল সরকার গিরমিটিয়া অর্থাৎ ভারতীয় মজুরদের উপর প্রতি বৎসর পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন-শ পঁচাত্তর টাকার করভার চাপাইবার প্রস্তাব করেন।

ইহার একটা ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা এখানে বলি। সেটা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ। নাটালে তখন প্রচুর আখের চাষ হইতেছে। সেখানকার গোরা বাসিন্দারা দেখিল এই আখের রস হইতে যথেষ্ট চিনি হইতে পারে। আর চিনি যত অধিক পরিমাণে তৈয়ার করা যাইবে ততই তাহাদের লাভও বেশী হইবে। কিন্তু মুশকিল হইল, মজুরের অভাব। মজুর না হইলে চাষের কাজও চলে না, কারখানার কাজও না।

কাজেই দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবর্ষের কথা মনে পড়িল। নাটালের অধিবাসী শ্বেতাঙ্গকুল ভারত-সরকারের কাছে বলিয়া কহিয়া অনেক মজুর নাটালে লইয়া আসে। শর্ত হয় যে—মজুররা পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে আসিবে। পাঁচ বৎসর কাজ করিবার জন্য তাহারা বাধ্য থাকিবে। পাঁচ বৎসর পরে যখন চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়া যাইবে, তখন তাহারা স্বাধীন হইবে। যদি ইচ্ছা করে তখন তাহারা নাটালে জমি কিনিয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করিতেও পারিবে।

মুক্তির পরে চাষবাস করিয়া ইহাদের যে লাভ হইল তাহা অপর্যাপ্ত। ইহার উপর আবার মজুরশ্রেণী ভারতবর্ষ হইতে নূতন শাকসবজি আনিয়া জমিতে রোপণ করিল। লাভের সন্ধান পাইয়া ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীরাও সেখানে যাইয়া জুটিলেন। এইবার গোরা ব্যবসায়ীদিগের টনক পড়িল। ব্যবসায়বুদ্ধিতে ভারতবর্ষ যে কাহারো অপেক্ষা কম যায় না — এ কথাটা তাহারা তখনও বোঝে নাই। সে যাহাই হউক ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হইতে বিলম্ব হইল না। সে আইনের মর্ম এই যে — চুক্তিবদ্ধ মজুর যদি চুক্তির পাঁচ বছর অন্তে ভারতে ফিরিয়া যায় উত্তম, না হইলে মজুর খাটিবার জন্য তাহাদের নূতন চুক্তি করিতে হইবে। নয়তো প্রতি বৎসর মাথা পিছু পঁচিশ পাউণ্ড কর দিতে হইবে। দরিদ্রদিগের প্রতি অন্যায় জুলুম সন্দেহ নাই। কিন্তু বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গান্ধীজি তাঁহার দলবল লইয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। লর্ড এলগিন তখন ভারতের গভর্নর-জেনারাল। তিনিও এতটা বাড়াবাড়ির বিপক্ষে ছিলেন। ফলে করের পরিমাণ পঁচিশ পাউণ্ড হইতে তিন পাউণ্ড অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ টাকায় নামিল।

করভার হ্রাস পাওয়াতেও গান্ধীজি খুশী হইলেন না। তবে গিরমিটিয়াদের দুর্দশা অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। এবং নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের আন্দোলনে করের পরিমাণ কমায় দক্ষিণ আফ্রিকায় উক্ত কংগ্রেসের মর্যাদাও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু

গান্ধীজির মনে হইল, ওই তিন পাউণ্ড করও যতক্ষণ না উঠিয়া যায় ততক্ষণ কংগ্রেসের আন্দোলন বন্ধ করা উচিত হইবে না। কর আদৌ কেন দিতে হইবে ? — এই নীতির প্রশ্নটাই তাঁহার কাছে বড় প্রশ্ন। কি পরিমাণ কর দিতে হইবে সে প্রশ্নটা গৌণ।

করভার তুলিয়া দিবার সংকল্প লইয়া নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস যে অন্দোলন আরম্ভ করিলেন সংকল্প পূর্ণ হইবার পূর্বে কংগ্রেস সে আন্দোলন ত্যাগ করেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। মহামান্য গোখলেও এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চলে। কত লোক বন্দুকের গুলিতে মরিয়াছে। কত হাজার লোক জেল খাটিয়াছে। কিন্তু মৃত্যু ব্যর্থ হয় নাই, দুর্ভোগ নিষ্ফল হয় নাই। অবশেষে সত্যের জয় হইল। কিন্তু সে হইল কুড়ি বৎসর পরের কথা।

যাহা হউক সুখে দুঃখে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির তিন বছর তো কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে তাঁহার ওকালতি ব্যবসাও বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজি এইবার স্ত্রী-পুত্র লইয়া আসিবার সংকল্প করিলেন। কংগ্রেস তখন পূর্ণ উদ্যমে জনসেবা চালাইয়া চলিয়াছেন। এ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার অবস্থান অপরিহার্য। তাই মাত্র ছয় মাসের জন্য দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

নাটালের গিরমিটিয়াদের অধিকাংশই ছিল উর্দু অথবা তামিলভাষী। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতে হইলে ওই দুইটি ভাষাই জানা আবশ্যক। গান্ধীজি জাহাজে

অবস্থানের চব্বিশটি দিন এই দুইটি ভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করেন।

রাজকোটে পৌঁছিয়াই তিনি একটি বই লিখেন। মলাটটির রঙ সবুজ ছিল বলিয়া পরে উহা 'সবুজ বই' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন অবস্থা লইয়া এই বইটি লিখিত। ইহারই প্রচারের ফলে দেশে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

২২ | অহিংসা

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বোম্বাইয়ে মড়ক দেখা দিল। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সীমা-পরিসীমা রহিল না। পাছে রাজকোটেও ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে — এই আশঙ্কায় সেখানে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। গান্ধীজি স্বেচ্ছায় এই দলে যোগদান করিলেন। তিনি ভার লইলেন পায়খানা পরিদর্শন করিবার। নিজের দলবল লইয়া তিনি অক্লান্তভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

'ঢেড়বাড়া' বা অস্পৃশ্যদের বস্তিতে যাইবার সময় কিন্তু সকলেই বাঁকিয়া বসিলেন। যাহাদের ঘরে পা দিলেই দেহ অপবিত্র হয়, তাহাদেরই শৌচাগার পরীক্ষা করা — সেও কি সম্ভব? স্বেচ্ছাসেবকেরা কেহই সম্মত হইলেন না।

গান্ধীজি বলিলেন, বেশ, আমি একলাই যাইব। সেবাবৃত্তির মধ্যে অস্পৃশ্যতার স্থান নাই। গান্ধীজিকে যাইতে দেখিয়া একজন তাঁহার সহিত অগ্রসর হইলেন, এই একজন সঙ্গী লইয়াই গান্ধীজি কর্তব্য সমাপন করিয়া আসিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সভাসমিতির আয়োজন করিতে হয়। সার ফিরোজ শার পরিচালনায় একটি সভা আহূত হইল। গান্ধীজি পূর্বদিনই তাঁহার

বক্তৃতা ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, এখানে সেটি পাঠ করা হইল। বক্তৃতাটি সুন্দর হইয়াছিল। সভায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন প্রভুত্ববিলাসী শ্বেতকায় ব্যবসায়ীদের হাতে কতকগুলি নিরপরাধ ভারতবাসী কি অকথ্য লাঞ্ছনা সহ্য করে।

মাদ্রাজ গান্ধীজির জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল। সেইদেশীয় মজুর বালসুন্দরমের কাহিনী যেন মাদ্রাজের ঘরে ঘরে। গান্ধীজি ইঁহাদের অভিলাষ পূরণ করিবার নিমিত্ত মাদ্রাজে একটি বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার দৈর্ঘ্য একটু বেশী হইয়াছিল — কিন্তু বক্তার কথনমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতারা তাঁহার শেষ কথাটি অবধি গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিল।

সেখান হইতে গান্ধীজি কলিকাতায় আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে অনেক পরামর্শ দিলেন। কলিকাতায় আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা হইল।

এমনিভাবে আন্দোলনের পথ ক্রমশ সহজ হইয়া উঠিতে-ছিল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তার আসিল — তাঁহাকে অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করিবার অবসর ছিল না। তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া দাদা আবদুল্লার নিজস্ব জাহাজ 'কুরল্যাণ্ডে' আরোহণ করিলেন। এই ষ্টীমারের সহিত 'নাদেরী' নামে একটি জাহাজও দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়াছিল। এটিরও এজেন্ট ছিলেন দাদা আবদুল্লা। উভয় জাহাজে মোট ভারতীয় যাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট-শ।

নাটাল পৌঁছিবার তিন-চার দিন পূর্বে সমুদ্রে তুফান উঠিয়া জাহাজ প্রায় ডোবে ডোবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিয়াই তাঁহাকে যে ঝড়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল — এ বোধ করি তাহারই পূর্বাভাস।

উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া জাহাজ দুইটি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ডারবানে নোঙ্গর করিল। তখন স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে পরীক্ষা না করিয়া কোনো যাত্রীকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইত না। গান্ধীজি আবার প্লেগ-রোগাক্রান্ত বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়মটা আরও একটু কঠোরভাবেই প্রযুক্ত হইল। তাঁহাদের আরও পাঁচদিন জাহাজে বাস করিতে হইল।

তেইশ দিন পরে ডকে তাঁহাদের নামিবার কথা, সকলেই প্রস্তুত হইয়াছেন, ইতিমধ্যে এস্‌কম্‌ব সাহেব সংবাদ পাঠাইলেন, গোরারা গান্ধীজির উপর চটিয়া আছে, দেখিতে পাইলে হয়তো মারিয়া ফেলিবে — সুতরাং সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন তিনি অবতরণ করেন। ডক-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার সঙ্গী হইবেন। গান্ধীজি রাজী হইলেন। ইহারই ক্ষণকাল পরে প্রসিদ্ধ উকিল মিস্টার লাটন আসিয়া তাঁহার সংকল্প ঘুচাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, শিশুদের লইয়া গান্ধীপত্নী রুস্তমজির বাড়িতে উঠুন। আমরা তাঁহার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইব। প্রাণের কোনো আশঙ্কা নাই। সবই এখন শান্ত, আর গোরারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

লাটন সাহেবের এই প্রস্তাব গান্ধীজির অসংগত বোধ হইল

না। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন—কিন্তু গান্ধীজির ভাগ্যে যে দুর্ভোগ ঘটিয়াছিল তাহা সামান্য নয়। নিতান্তই বিধাতার আশীর্বাদে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

লাটনকে লইয়া গান্ধীজি জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। যুবক গোরারা কোথায় লুকাইয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। ভিড় জমিতে বেশী সময় লাগে না। লাটন দেখিলেন বিপদ গুরুতর— এই উন্মত্ত জনতা না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তিনি একটি রিকশ ভাড়া করিলেন। মানুষ টানে বলিয়া রিকশ চড়া চিরকালই গান্ধীজির নীতিবিরুদ্ধ। তবে আপৎকালে অত বাছবিচার করা উচিত নয় মনে করিয়া চড়িতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আক্রমণকারীরা ভয় দেখাইয়া রিকশওআলাকে হটাইয়া দিল। সে বেচারি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

ভিড় এদিকে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। কয়েকজন লাটনকে টানিয়া দূরে সরাইয়া দিল। এইবার গান্ধীজি সম্পূর্ণ একাকী। ষণ্ডামার্কা কতকগুলা গুণ্ডার সহিত তিনি যুঝিবেনই বা কেমন করিয়া? ইট-পাটকেল, পচা ডিম, ঘুষি এবং লাথি আপাদমস্তক বর্ষিত হইতে লাগিল। গান্ধীজির চেতনা প্রায় লুপ্ত হইতেছিল। তিনি কোনোমতে একটি বাড়ির রেলিং ধরিয়া অতিকষ্টে নিজেকে খাড়া রাখিলেন। পাষণ্ডগুলা তথাপি নিবৃত্ত হইল না।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী ওই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। গান্ধীজিকে তিনি চিনিতেন। এই মহিলা

অপূর্ব সাহসে ভর করিয়া জনতার মাঝখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর হাতের ছাতাটি মেলিয়া ধরিয়া তাহারই আড়ালে রাখিয়া গান্ধীজিকে ধীরে ধীরে জনতার মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

গোরারা তখন ক্ষান্ত হইল বটে কিন্তু শিকারের পিছনে পিছনে দল বাঁধিয়া চলিল। ইতিমধ্যে কোনো ভারতীয় যুবক ছুটিয়া গিয়া পুলিসে খবর দিয়াছিল। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার আলেকজাণ্ডার সংবাদ পাইয়া গান্ধীজির উদ্ধারের জন্য একদল রক্ষী পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা চক্রাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়া রুস্তমজির বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিল। আঘাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। জাহাজের ডাক্তার দাদীবরজোর এইবার তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাহিরে কিন্তু দুর্যোগ ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছিল। দলের পর দল গোরা আসিয়া রুস্তমজির বাড়ির সম্মুখে জমা হইয়াছে। তাহাদের মুখে এক কথা—গান্ধীকে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দাও।

এদিকে রাত্রি আসন্ন। পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বুঝিয়াছিলেন গোরারা সহজে ছাড়িবে না—তাই হাস্যপরিহাস করিয়া এই উন্মত্ত জনতাকে বশে রাখিয়াছিলেন। সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। তেমন করিয়া ক্রুদ্ধ জনতাকে কতক্ষণ ভুলাইয়া রাখা যায়? তিনি বিপদ বুঝিয়া ভিতরে খবর পাঠাইলেন—গোরাদের আর বেশীক্ষণ সামলাইয়া রাখা যাইবে না। তাহারা যদি একবার

ভিতরে প্রবেশ করে তবে সকলেরই বিপদ, বিশেষত রুস্তমজির। জনতা ভিতরে ঢুকিলে ঘরবাড়ি জিনিসপত্র কিছুই অক্ষত রাখিবে না। গৃহের অধিবাসীদের প্রতিও অত্যাচার হইতে পারে। সব দিক রক্ষা করিতে হইলে গান্ধীজিকে ছদ্মবেশে স্থানত্যাগ করিতে হইবে।

আশ্রয়দাতা বিপদে পড়েন ইহা তিনি চাহেন না। তিনি তাই ছদ্মবেশ পরিধান করিলেন। পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাহায্যে গান্ধীজি ভারতীয় কনস্টেবলের সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। হঠাৎ চিনিতে পারিয়া শ্বেতাঙ্গকুল যদি ঢিল ছোঁড়ে তবে সে আক্রমণ হইতে মাথাটি বাঁচাইবার জন্য মাথার উপরে একটি ভারী বাটি বসানো হইল। ইহার চারিদিকে বাঁধা হইল মাদ্রাজী পাগড়ি। সঙ্গে দুইজন ডিটেক্টিভ ছিলেন। ইঁহাদের একজন মুখে রঙ মাখিয়া ভারতীয় বণিক সাজিলেন। গান্ধীজি এই ভাবে থানায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

গান্ধীজি নিরাপদে চলিয়া গেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন — তোমাদের শিকার এই দোকান দিয়া পালাইয়াছে। এখানে থাকিয়া আর কি হইবে? এবার বাড়ি ফিরিয়া যাও।

এ-কথা প্রথমে কেহই বিশ্বাস করিল না। দুইজন মিস্টার আলেকজাণ্ডারের সহিত বাড়িঘর খুঁজিয়া আসিল, কিন্তু কোথায় তাঁহাকে পাইবে? তখন চক্রান্ত বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না। ধীরে ধীরে সকলেই প্রস্থান করিল।

চেম্বারলেন সাহেব তখন ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক মন্ত্রী।

গান্ধীজির প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের সংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়া তার করিলেন। তিনি হুকুম দিলেন, গান্ধীজি যদি ইচ্ছা করেন অপরাধীদিগের বিপক্ষে নালিশ করিতে পারেন এবং কর্তৃপক্ষ এ বিষয় তাঁহার সাহায্য করিবেন। এস্‌কম্‌ব সাহেব এই সংবাদ দিলে গান্ধীজি বলিলেন, নালিশ করিবার তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।

আততায়ীদের কয়েকজনকে তিনি চিনিতেন। ইচ্ছা করিলে আইনের সাহায্যে গান্ধীজি তাহাদের শাস্তি দেওয়াইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা হইয়াছিল এই দণ্ডদানের কোনো সার্থকতা নাই। যাহারা হাঙ্গামা করিয়াছিল দোষ তো তাহাদের নহে, দোষ উপরওআলাদের।

গান্ধীজি জানিতেন নাটালের গোরাদের রাগিবার কারণ কি। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যুক্তি করিয়াছেন —এই তাহাদের অভিযোগ। স্বয়ং এস্‌কম্‌ব সাহেবও সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনিই যদি এ সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা হইলে নাটালের ইউরোপীয় জনসাধারণই বা অবিশ্বাস করিবে কেন? আর তাহারা যদি এ কথা বিশ্বাস করে, তবে তাহাদের ক্রুদ্ধ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

গান্ধীজি স্পষ্টই বলিলেন যে যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে এই অত্যাচারের জন্য দায়ী করিতে হয় তো তিনি এস্‌কম্‌ব সাহেবকেই দায়ী করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে জনসাধারণকে

শান্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু অসত্য সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিজেও গান্ধীজির উপর বিরূপ হওয়ায় এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, যে দুঃখ তিনি ভোগ করিয়াছেন কয়েকজন লোককে দণ্ড দিয়া তিনি তাহার প্রতিশোধ লইতে চান না। একদিন তাহারা জানিতে পারিবে যে তাহারা অন্যায় করিয়াছে। সেদিন তাহারা অনুতাপ করিবে এবং সেই অনুতাপই হইবে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি।

এস্‌কম্‌ব সাহেব এ-কথা শুনিয়া বলিলেন, গান্ধীজি যদি এ-কথা লিখিয়া দেন তবে চেম্বারলেন সাহেবকে তাহা জানানো সম্ভব হয়। গান্ধীজি সেই মুহূর্তেই লিখিয়া দিলেন।

সুযোগ পাইয়াও অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ না করায় গান্ধীজির প্রতি সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পড়িল। কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণিত হইল যে গান্ধীজির বিরুদ্ধে আফ্রিকার গোরাদের অভিযোগ যে সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত সে সংবাদটাই অমূলক। সংবাদপত্রসমূহও স্বীকার করিল গান্ধীজি নির্দোষ। এই ব্যাপারের পর হইতে গান্ধীজির খ্যাতি যে পরিমাণে বাড়িল ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল।

তাহার পর হইতে পঞ্চাশটি বছর কাটিয়াছে। আজিকার ভারতবর্ষের দিকে আজিকার ভারতবাসীর দিকে এবং আজিকার এই বৃদ্ধবয়সী সচ্চিদানন্দ বালকের দিকে তাকাইয়া সেদিনকার সেই আঠাশ বৎসরের যুবক গান্ধীজিকে নমস্কার করি।

—

পরিশিষ্ট

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮৭ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রশ্নাবলী।

UNIVERVERSITY OF BOMBAY

MATRICULATION EXAMINATION, 1887

Monday, 21st November, 1887

(2 P.M. to 5 P.M.)

ENGLISH

D. MacDonald, M.D., B.Sc., C.M.
The Rev. J. M. Hamilton, S. J.

R. H. Gurion, B.A. R. B. Stewart, C.S., B.A.
J. Oliver, Esq. Barjorji Jamsji Padshah, B.A.
A. Barrett, B.A.

Ten marks are assigned to legibility and general neatness of writing.

1. Paraphrase :—

Evening to all is Welcome ! Faint and Sweet
The light falls round the peasant's homeward feet,
Who, slow returning from his task of toil
Sees the low Sunset gild the cultured Soil,
And, though such radiance around him brightly glows,
Marks the small spark his cottage window throws.
Still as his heart forestalls his weary pace,
Fondly he dreams of each familiar face,
Recalls the treasures of his narrow life—
His rosy children and his sun-burnt wife,
To whom *his* coming is the chief event
Of simple days in cheerful labour spent,
The rich man's chariot hath gone whirling past,
And these poor cottagers have only cast

One careless glance on that show of pride,
Then to their tasks turned quietly aside ;
But him they wait for, him they welcome home,
Fixed sentinels look forth to see him come ;
The faggot sent when the fire grew dim,
The frugal meal prepared, are all for him,
For him the watching all that Sturdy boy,
For him those smiles of tenderness and joy,
For him—who plods his Sauntering way along,
Whistling the fragment of some village song.

2. Write an essay of about forty lines on the advantages of a cheerful disposition.
3. Explain the following sentences :—
   (a) He had the subject so completely at his fingers' ends that he had no difficulty in answering the paper.
   (b) It would be a kindness on your part to put the best construction on his conduct.
   (c) If he erred at all, he erred on the safe side.
   (d) A man who tries to do too much may sometimes fall between two stools.
   (e) Be careful how you act, so as to avoid taking a leap in the dark.
   (f) He stole a march upon his rival.
   (g) A man who has received no education is greatly handicapped in the battle of life.
   (h) He is too much inclined to give himself airs.
   (i) Whilst the one was bent upon adding fuel to the fire, the other made an effort to pour oil on the troubled waters.

4. (a) Give the masculine or feminine of the following words :—
Hero, man-servant, duke, fox, marquis, ewe.
(b) Give plural, or plurals if there are more than one, of the following :—Formula, index, staff, calf, grotto, potato, die, cow.
(c) Give the comparative and superlative of the following words :—Many, bad, old, up, hind, in, nigh, little.
5. Define the following terms :—Pleonasm, nominative, absolute, ellipsis, apposition, simile, metaphor. Give an example of each.
6. Assign as meanings as you can to each of the following words :—
Dear, expire, case, light, duties, spirits, late, carriage, diversion.
7. Write sentences illustrating the meaning of the following words when followed, respectively, by the different prepositions given :—

Change	..	..	with, for
Confer	..	..	on, with
Confide	..	..	in, to
Correspond	..	..	with, to
Disappointed	..	..	of, in.

8. Parse the italicised words in the following sentences :—
(a) *Tom* hurt the barber's fingers.
(b) He handed the *lady* a chair.
(c) The monstrous faith of *many made* for *one*.
(d) *Methinks* the lady doth protest too much.

(e) Although in childhood he *promised* well, yet in later life he *turned* out a *fool*.

(f) The rogue and fool by *fits* is fair and wise.

9. Turn the following into indirect narration :—

Miss B.—"You write uncommonly fast."

Mr. D.—"You are mistaken. I write rather slowly."

Miss. B—"How many letters you must have occasion to write in the course of the year ! Letters of business too ! How odious I should think them."

Mr. D.—"It is fortunate, then, that they fall to my lot instead of to yours."

Miss B.—"Pray, tell your sister that I long to see her."

Mr. D.—"I have hold her so once, by your desire."

Miss B.—"I am afraid you do not like your pen. Let me mend it for you. I mend pens remarkably well."

Mr. D.—"Thank you, but I always mend my own."

Miss B.—"How can you contrive to write so even ?"

He was silent.

Miss. B.—Tell your sister I am delighted to hear of her improvement on the harp ; and pray let her know that I am quite in raptures with her beautiful little design for a table, and I think it infinitely superior to Miss Grantley's."

Mr. D.—"Will you give me leave to defer your raptures till I write again ? At present I have no room to do them justice."

The candidate may substitute for the piece set for paraphase a translation into English of any of the following languages :

[এইখানে গুজরাটী ভাষায় দুইটি গদ্যাংশ দেওয়া আছে]

—

UNIVERSITY OF BOMBAY

MATRICULATION EXAMINATION, 1887

Tuesday, the 22nd November, 1887

(2 P.M. to 5 P.M.)

ARITHMETIC AND ALGEBRA

Govind Vithal Kurkaray, B.A.
Kavasji Jamshedji Sanjana, M.A.

1. Simplify :

$$\frac{\cdot142857 \times \cdot076923}{\cdot010989} \text{ plus } \frac{2\cdot75 \times 11\cdot25}{6\cdot2}$$

2. If 9 lbs. of rice cost as much as 4 lbs. of sugar, and 14 lbs. of sugar are worth as much as $1\frac{1}{2}$ lbs. of tea, and 2 lbs. of tea are worth 5 lbs. of coffee, find the cost of 11 lbs. of coffe if $2\frac{1}{2}$ lbs. of rice cost $6\frac{1}{4}$d.
3. If Rs. 165 annas 14 and pies 17/17 be the discount of debt of Rs. 2820, simple interest being at the rate of $3\frac{3}{4}$ per cent, how many months before due was the debt paid ?
4. The price gold is £ 3-17 s. $10\frac{1}{2}$ d. per oz. : a composition of gold and silver weighing 18 lbs. is worth £637-7 s., ·but if the proportion of gold and silver were interchanged, it would be worth only £259-1 s.

Find the proportion of gold and silver in the composition and the price of silver per oz.

5. By selling 4 dozen mangoes for 13 rupees, it was found that 3/10ths of the outlay was gained ; what ought the retail price per mango to have been in order to have gained 60 per cent ?

6. If a plus b=c plus d, prove that either of them is equal to $\frac{abcd}{ab+cd}\left(\frac{1}{a} \text{ plus } \frac{1}{b} \text{ plus } \frac{1}{c} \text{ plus } \frac{1}{d}\right)$

and if x plus $\frac{1}{y} = 1$ and y plus $\frac{1}{z} = 1$

prove that z plus $\frac{1}{x} = 1$ and xyz plus 1=0

7. Simplify :—

(1) $\frac{(b \text{ plus } c)(x^2 \text{ plus } a^2)}{(c-a)(a-b)} \text{ plus } \frac{(c \text{ plus } a)(x^2 \text{ plus } b^2)}{(a-b)(b-c)}$

plus $\frac{(a \text{ plus } b)(x^2 \text{ plus } c^2)}{(b-c)(c-a)}$

(2) $\left(\frac{x}{y} \text{ plus } \frac{y}{z} \text{ plus } \frac{z}{x}\right)\frac{(x+z+y)}{xyz} -$

$$\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{z}\right)\frac{y}{z}+\frac{z}{x}+\frac{z}{x}+\frac{x}{y}$$

8. Show that $(ax+by+cz)^3+(cx-by+az)^3$ is divisible by $(a+c)(x+y)$ and find the three factors of

$$x^3-2x^2-23x+60$$

9. Extract the square root of

$$(a-b)^2\,(a-b)^2-2(a^2+b^2)\,2(a^4+b^4)$$

10. Solve the equation

$$\frac{x-8}{x-10}-\frac{x-5}{x-7}=\frac{x-7}{x-9}-\frac{x-4}{x-6}$$

11. A number consists of three digits, the right hand one being zero. If the left hand and middle digits be interchanged the number is diminished by 180, if the left hand digit be halved, and the middle and right hand digits be interchanged, the number is diminished by 336. Find the number.

—

UNIVERSITY OF BOMBAY

MATRICULATION EXAMINATION, 1887

Wednesday, 23rd November, 1887

(2 P.M. to 4 P.M.)

EUCLID

Govind Vithal Kurkaray, B.A.,
Kavasji Jamshedji Sanjana, M.A.

1. The straight line which joins the middle point of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. Prove this with the help of the First Book only.
2. Describe a parallelogram that shall be equal to a given triangle, and have one of its angles equal to a given rectilineal angle.
3. In obtuse angled triangles, if a perpendicular be drawn from either of the acute angles, the opposite side produced, the squares on the side subtending the obtuse angle is greater than the squares on the sides containing the obtuse angle, by twice the rectangle contained by the side on which when produced the perpendicular falls, and the straight line

intercepted without the triangle, between the perpendicular and the obtuse angle.

4. ABC is an equilateral triangle ; in BC produced, D is taken so that the rectangle BD. DC is equal to the square on BC. Prove that the square on AD is equal to twice the square on AC.
5. Draw a straight line from a given point, either without or in the circumference, which shall touch a given circle.
6. If from any point without a circle there be drawn two straight lines, one of which cuts the circle and the other meets it ; and if the rectangle contained by the whole line which cuts the circle and the part of it without the circle be equal to the square on the line which meets the circle, the line which meets the circle shall touch it.
7. From an exernal point O, OP is drawn to touch a circle and OQR to cut it ; and it is found that OP is twice the radius, and that OR is twice OQ. Prove that QR subtends a right angle at the certre.
8. Describe a circle in a given triangle.
9. If a circle be inscribed in a right angled triangle, the excess of the sides containing the right angle over the hypotenuse is equal to the diameter of the circle.

—

UNIVERSITY OF BOMBAY
MATRICULATION EXAMINATION, 1887
Thursday, 24th November, 1887
(2 P.M. to 5 p.M.)
GUJRATI

Chimanlal Harilal Setalvad, B.A.,LL.B

1. Translate into Gujarari the following passage :- –
I shall, therefore, rejoice if part of the fund to be raised to commemorate the Jubilee of the Queen Empress be devoted to enabling India to take her place in the new industrial world into which she has entered during the first fifty years of Her Majesty's reign. I hail the circumstance that at this very juncture the need of technical education in India has been powerfully borne in on the mind of Her Majesty's honoured representative in this land. I look upon this as a providental opportunity for directing a portion of the national wealth to a permanent means of national progress. India will rejoice in many ways that her beloved sovereign has been spared to reign during so many glorious years. Illuminations, statues, memorial buildings, the feeding of the poor are each and all fitting expressions of the glad heart of the people. But to enable India to worthily fill the new place which she has won in the industrial world during Queen Victoria's reign, seems to my mind one of the noblest purposes to which the thanks-offerings of a greâteful nation can be devoted. For the last illumination will sputter out into darkness, and

time will lay its defacing finger on the marble and the bronze ; but the education of the people has within itself an inherent life which can never perish and which will throw out new and ampler growths from generation to generation.

2. Translate into English the following :—

[এইখানে একটি গুজরাটী গদ্যাংশ দেওয়া আছে]

3. Parse fully the words underlined in the above passage.

4. (a) Define the following terms :—
বর্ণ, অর্থ, ক্রিয়ানাথ, অনুকরণ, সংযোজক, তদ্ধিত।
(b) How are words classified, having regard to their meanings ? Give an instance of each class.

5. Give the following forms of the root with their exact meaning :—
(a) মূলভেদ, ভবিষ্যবর্তমান কাল, সংশয়ার্থ, তৃতীয়পুরুষ একবচন।
(b) সহ্যভেদ, বিশেষ ভূত বর্তমানকাল, নিশ্চয়ার্থ, তৃতীয় পুরুষ একবচন।
(c) প্রেরকভেদ, দ্বিতীয় ভূতকাল, সংশয়ার্থ, প্রথম পুরুষ একবচন।
(d) প্রেরকভেদ, ভবিষ্যকাল, আজ্ঞার্থ, দ্বিতীয় পুরুষ একবচন।

6. Name and dissolve the following compounds :—
কালুঁধোলুঁ, অট্ঠাবীশ, লোকলাজ, বুদ্ধিধন, নর্মগদ্য, কুভার, গৃহস্থ, মধরাত, ত্রিভুবন, যথাশক্তি।

7. Give the derivations of the following words and show the connection between their present meanings and those derivations :—
ধরী, বৃত্তি, রসোড়ুঁ, রখবাল, পগরখুঁ, আসন।

8. Paraphrase into Gujarati the following lines :—

[এখানে একটি গুজরাটী পদ্যাংশ আছে]

UNIVERSITY OF BOMBAY

MATRICULATION EXAMINATION, 1887

Friday, 25th November

(11 A.M. to 1 P,M,)

HISTORY AND GEOGRAPHY

W. Doderet, C.S. ; Pestanji Jamasji Padshah, M.A.

1. Who was the last of the Saxon Kings of England ? Describe briefly the events which led to their extinction.
2. Write a short history of the Puritan Rule in England.
3. What events led to the American War of Independence ? Describe the concluding events of the War.
4. State briefly what you know of the following :— The Gurkhas, Nadir Shah, the Siege of Gijni, the battle of Gujarat, the treaty of Yendabu.
5. What accessions were made by Wellesley to the British possessions in India and how ?
6. Name the principal States comprising the present German Empire.
7. Draw a map tracing the course of the Rhine, mark out by means of boundaries of countries through which it passes ; and insert the names of the chief towns on the river's banks.
8. State what you know of the following :— The snow-line, an oasis, a mirage, a crater, isothermal lines, a lagoon.

—

UNIVERSITY OF BOMBAY

MATRICULATION EXAMINATION, 1887

Friday; 25th November, 1887

(2 P.M. to 4 P.M.)

NATURAL SCIENCE

Kavasji Dadabhai Naegamvala, M.A., F.R.A.S., F.I.C.
Nanabhai Ardesir Moos, L.C.E., B.Sc. (Edin.), F.R.S.E., P.H.A.S., F.C.S.

N.B.—Divide your paper into two Sections, A &B

SECTION A

1. Show that forces may be represented by straight lines. Prove that when two forces intersect at right angles, they and their resultant are proportional to the sides of a right-angled triangle.
2. A man who weighs five maunds, wishing to raise a rock, rides the end of a crowbar 5 ft. long which is propped at the distance of 5 inches from the end in contact with the rock. What is the pressure on the prop ?
3. Find the ratio of P to W in a single moveable pulley when the cords are not parallel, and compare the mechanical advantage gained in such a case with that obtained when the cords are parallel.
   Determine the force necessary to raise a weight of 2400 lbs. by an arrangement of a set of six moveable pulleys in which the same cord passes round each pulley.
4. Explain the meaning of the symbols HCl, $KClO_3$, NaCl, and write down the chemical formulae for Neramic Oxide, Lime, and Sulphuric acid.

5. What happens when the metal Potassium is thrown into water ? Give the reaction in symbols and mention the principal properties of the Gas produced.

SECTION B

6. What is the result if you blow the air from your lungs for a long time through clear lime-water ? Where do the growing plants obtain the carbon which they need for their growth ?
7. What is the main difference between fresh spring water and sea water ? Explain how drinkable water may be obtained from sea-water.
8. When is Venus the morning and when the evening star ? Why have the transits of this planet been observed with so much care ?
9. How many times is Mars smaller than the Earth ? Describe its general appearance as seen through the telescope.
10. Give two of the most obvious and convincing proofs of the rotundity of the Earth, and state clearly why the days and nights are unequal in length in different parts of the world.

—